আনন্দমেলা



২ জানুয়ারি ১৯৮০
১/-
আনন্দবাজার-প্রকাশন



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

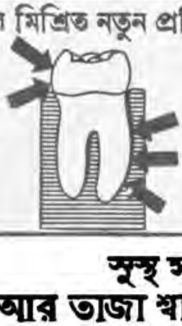
মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

নতুন প্রমিস

এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল



লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট



১. দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করতে সাহায্য করে।

২. মুখের ভেতর তাজা রাখার দরুন নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে দেয় না।

সত্যি!
প্রমিসের মত
এমন টুথপেস্ট তৈরী করার
কথা আগে কেউ
ভাবেনি কেন?



সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

"কেবলমাত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যায়"

CHAITRA-BLS-36

আনন্দমেলা

১৭ পৌষ ১৩৮৬ • ২ জানুয়ারি ১৯৮০ • ৭ বর্ষ • ১৬ সংখ্যা

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা
দুর্ঘটনার রাতে । লীলা মজুমদার ১০

গল্প
দাদুর সঙ্গে মনিং ওয়াক । জীবন ভৌমিক ৩১
বন্ধু । আরতি দাস ৪৩
সিঁড়িভাঙা বন্ধ । দিগ্‌দর্শক ৪৯

ভ্রমণ-কাহিনী
জুরিখের মেলা । অমলকুমার বসু ৪

উপন্যাস
হাড়-চূড়ায় আতঙ্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫
কে । বিমল মিত্র ২৭

আত্মকথা
খেলতে-খেলতে । চুনী গোস্বামী ৩৭

ছড়া
পলটু-মামা ! আদিনাথ নাগ ২৫
ওয়ান-টু । মুস্তাফা নাশাদ ২৫
নামের মাহাত্ম্য । রাধারমণ গোস্বামী ৪১
বড়মামা । শিশির চক্রবর্তী ৪৪

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪

লেখাপড়া
ভাষার খেলা । কুন্তক ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো
পাকিস্তানের আরও দু'জন । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫১
শুরু করবেন সানি । অশোক দাশগুপ্ত ৫৩
বোম্বাইয়ে জয় । পুষ্পেন সরকার ৫৫

অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪৫
তোমাদের পাতা ৪৬, নদনদী ৫৯
আঁকো-শেখো ৬৬

জাভেদ মিয়াঁদাদের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৫০

প্রচ্ছদ বিমল দাস

সম্পাদক **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাংপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা



মেলার মাঠে বেলুন উড়ছে



কেব্‌ল-কার ছুটছে পাহাড়ের উপর দিকে

জুরিখের মেলা

অমলকুমার বসু

ছবির মতো সাজানো দেশ সুইটজারল্যান্ড। ছোট্ট দেশ, কিন্তু প্রধান ভাষা তিনটি— জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান। ২৬টি ছোট ছোট প্রদেশ, ওরা বলে 'ক্যান্টন'। আল্পস পর্বত, ছোট-বড় অজস্র লেক, প্রচুর বনভূমি —এই নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত দেশ, টুরিস্টদের স্বর্গ সুইটজারল্যান্ড। পর্যটনশিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় হোটেল-ব্যবসা। এছাড়া এখানকার ঘড়ি-শিল্পের জগৎজোড়া নামডাক। আর সুইস চকোলেট? নাম শুনলেই তো জিভে জল আসে।

সুইটজারল্যান্ডের অন্যতম প্রধান শহর হল জুরিখ। প্রায় চার লক্ষ লোকের বাস। ব্যবসা-বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। শহরে যানবাহনের মধ্যে আছে ট্রাম, কিছু বাস, খুব দ্রুতগামী ট্রেন, আর লেকের জলে রয়েছে স্টীমার সার্ভিস।

জুরিখ লেকের কাছে স্বপ্নপুরীর



বরফে-ঢাকা পাহাড়চূড়া মঁ ব্লাঁ



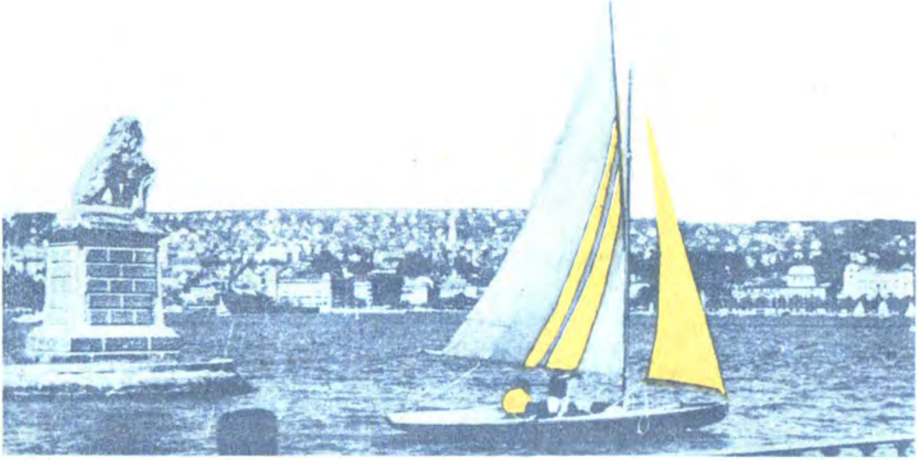


নাগরদোলায় দারুণ মজা



মতো এক হোটেল — নাম 'ইমপার্ক'। পাহাড়ের ওপর যেন কেটে বসানো হয়েছে কয়েকটি সুন্দর সাজানো বাড়ি। নীচের রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে, আর ওপরে আছে ফুল-বাগান, ঝকঝকে পিচ-ঢালা রাস্তা। অনেকটা দার্জিলিং শহর। শীতের তীব্রতা তেমন নেই জুনের শেষে, তবে মাঝে ২।১ দিন বৃষ্টি হওয়াতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া। লেকের হাওয়ায় কিন্তু হাড়ে কাঁপন লাগে।

জানা ছিল না, ১৯৭৯ সালের জুন মাসের ঐ শেষ দিনটি জুরিখের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। প্রতি চার বছর পর এরকম মেলা বসে। চলে দুদিন ধরে। এই প্রকাণ্ড মেলার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে অনেক লিখতে হবে। অল্প কথায় বলতে গেলে একটা বিশাল যজ্ঞের আয়োজন। লেকের ধারে ধারে সবুজ মখমলের মতো ঘাস, তার ওপর বসেছে এই মেলা। পাঁপরভাজার বদলে হটডগ, হ্যামবার্গার, চিজ স্যাণ্ডউইচ, আলুভাজা, পপকর্ন, আইসক্রীম। কাঠের বেঞ্চ পাতা—কেনো, খাও আর ঠোঙা ফেলে দাও কাছের বিনে, সবুজ ঝকঝকে পরিষ্কার মাঠ, নোংরা ফেলতে হাত সরে না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে



জ্যুরিখ হ্রদে পালতোলা নৌকো



পাহাড়ে ওঠার কায়দা রপ্ত করছে শিক্ষার্থীরা



গ্রামের পথে অজস্র ফুল। আর দেখা যায় ফুলের মতো শিশুদের

বেড়াতে এসেছে বাবা-মা'রা। বেশ ভিড়। এক জায়গায় নানারকমের বাদ্যযন্ত্র, প্রচুর মাইক, রঙিন আলো, উচ্চগ্রামে চলেছে পপ মিউজিক, জাজ বাজনা, কনসর্ট—কয়েকজন নামকরা মিউজিসিয়ান আসবেন রাত্রে সংগীত পরিবেশন করতে, তারই তোড়জোড় চলেছে। এক কোণে স্কাউটদের ক্যাম্প। উৎসাহী স্কাউটদের দল গাছে দড়ি বেঁধে নানা রকম খেলা দেখাচ্ছে। কী করে পাহাড়ের ওপরে বিপন্ন পথযাত্রীদের 'রেসকিউ' করতে হয় কসরত চলেছে তারই, আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভেলায় করে লেকের ওপর বেড়িয়ে আনছে। দুটো গাছে দড়ি বেঁধে লোহার ড্রামে বাচ্চাদের বসিয়ে জলের ওপর পারাপার করছে। এই সঙ্গে কুপন বেচে স্কাউটিং ফান্ডের জন্য টাকাপয়সা তুলছে। ক্যাম্পের অদূরে বসেছে বিরাট কার্নিভ্যাল, নাগরদোলা, চেয়ার-লিফট, অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন খেলনা মোটরগাড়ি। আকাশে দ্রুতবেগে হঠাৎ উঠে যাওয়া আর পরমুহূর্তে চিলের মতো নেমে আসা—সে এক রুদ্ধশ্বাস খেলা। মনে হয় প্রতি মুহূর্তেই সংঘাতের সম্ভাবনা, কিন্তু কিছুই হয় না, সবাই যার যার জায়গায় নিরাপদে ফিরে আসে।

সুইটজারল্যান্ড দুধ আর চকোলেটের দেশ। মেলার এক কোণে ছোট চকোলেট প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। প্রচুর বিক্রি. নানা-আকারের, নানা ধরনের চকোলেট, বিভিন্ন স্বাদ। ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে পড়লাম মেলার 'পুরনো বাজার' এলাকায়। ছোট ছোট স্টল, বাড়িতে ব্যবহার করা ভাঙা বা পুরনো জিনিসপত্র সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। খুব পুরনো ঘড়ি, জামাকাপড়, কাঠের আসবাবপত্র, রান্নার জিনিসপত্র বহুবছর পর অ্যান্টিক হয়ে যায়। বেশ চড়াদামে বিক্রি হচ্ছে। খুব ভিড়। পুরনো বাজার ছাড়িয়ে আবার লেকের পাড়ে দেখলাম বেশ খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা হয়েছে। মাঠের ওপর রঙিন প্ল্যাস্টিক শীট ছড়ানো আছে। খানিক পরে দুটো মোটর ভ্যান এসে সেই বড় বড় শীটগুলোর মধ্যে হাওয়া ভরতে আরম্ভ করল যেমন গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরে। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে রবার প্লাস্টিক ফুলে-ফেঁপে ঢোল, পরিণত হল প্রকান্ড আকারের রঙিন বেলুনে। নীচে আবার বেতের ঝুড়ি বেলুনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আর-একটা ভ্যানে কয়েকজন বেলুন-যাত্রী তাদের চিত্রবিচিত্র পোশাকে এসে হাজির হল। হাতে সিলিন্ডার ভর্তি গরম


জ্যুরিখের ট্রাম। পিছনে হ্রদ

হাওয়া। বিউগল বেজে উঠল বেলুন-ক্লাব থেকে। বেলুনযাত্রীরা হাত নাড়তে নাড়তে আকাশে উড়ে গেল একে একে। এইভাবে চারটি বেলুন ছাড়া হল পর পর। লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম সওয়ারিদের নিয়ে বেলুন-গুলো আকাশে উড়ে গেল, ছোট হতে হতে ক্রমশ যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হল। মাঝে মাঝে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। পরে বেলুন-ক্লাবের কর্তাদের কাছে জানা গেল, ১৯০৯ সালে এই এরো ক্লাব যাত্রা শুরু করে। ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এরো ক্লাবে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। কার্ড আর ডাকটিকিট বিক্রি করে পয়সা তুলছে ক্লাবের ছেলেমেয়েরা। সুইশ ডাকটিকিট কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর।

মেলার একদিকে ফুলের মতো অনেক শিশুর সমাবেশ। রঙিন সাজে সেজে প্রায় একই বয়সের শিশুরা পাখির মতো কিচির-মিচির করছে। সবাই সুইশ, প্রত্যেকেই তার প্রিয় খেলনা হাতে করে মেলায় এসেছে। দর্শকদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছোট ছোট উপহার বিতরণ করছে। আমার কাছে ছিল কয়েক খন্ড আনন্দমেলা, অবসর-সময়ে বিদেশে


মেলার মাঠে হরেক মজা


পাহাড় আর অরণ্যের মধ্য দিয়ে


জ্যুরিখ হ্রদ

পড়ব বলে সঙ্গে এনেছিলাম। জনা-কয়েক শিশুর মধ্যে সেগুলো বিলি করে দিলাম। রঙিন ছবির বই পেয়ে কী খুশি সব! বারবার ধন্যবাদ দিতে ভুলল না, আর সেই ধন্যবাদের সঙ্গে খুউব আন্তরিকতা মেশানো ছিল।

বিকেল ৬টা বাজে, রোদের তীব্রতা কমে আসছে। সন্ধে হতে তখনও অনেক দেরি। গ্রীষ্মকালে এদেশে অন্ধকার হয় অনেক পরে, প্রায় সাড়ে-আটটা নটায়। আজ আবার লেকের মধ্যে থেকে বাজি ছোঁড়ার মহোৎসব আছে। ভাল করে অন্ধকার না হলে জমবে না। সেজন্য শুরু হবে রাত ১০টায়। ২৬টি ক্যান্টনের মধ্যে বাজি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হবে এক ঘণ্টা ধরে, বুঝতে পারছ কী ধুন্ধুমার কাণ্ড। যথাসময়ে বোট থেকে বাজি ছাড়া শুরু হল, আলোর ঝলকানিতে আকাশ ঝলসে উঠল। লেকের জলেও সেই আলোর প্রতিবিম্ব। মাঝে মাঝে কানফাটা আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

শনি-রবি মাত্র দুদিনের জন্য এই বিরাট আয়োজন! সোমবার আবার যে-কে-সেই। কে বলবে জুরিখে গত দুদিন ধরে এক বৃহৎ আনন্দযজ্ঞ [illegible]



নিচে বাগান, উপরে কেব্‌ল্‌-কার



ছুটছে রেলগাড়ি





জলের উপরে ঝুঁকে আছে প্রাচীন ঘরবাড়ি



দুর্ঘটনার রাতে

লীলা মজুমদার

গত ১২ নভেম্বর হাওড়া থেকে দিল্লি রওনা হয়ে মাঝরাত্তিরে রাজধানী এক্সপ্রেস কীভাবে এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছিল, কাগজে তার খবর তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। লাইনচ্যুত একটি বগির মধ্যে ছিলেন তোমাদের প্রিয় লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তিনি তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা এখানে শোনাচ্ছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা, এই তো আমার দৌড়। দরজা বন্ধ করলে খোলা যায় না, খুললে বন্ধ হয় না, আলোর ফোকর থাকে আলো থাকে না, পাখার পাখনা নেই। হট্টগোল ঘেঁষাঘেঁষি, নামি যখন সারা গায়ে বিড়ির আর অন্য লোকের ঘামের গন্ধ। সঙ্গী-দের অনেকের পকেটে টাকাকড়ি থাকে, তা যাত্রা শেষে সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো গাড়ি এক ঘণ্টা দেরিতে চলে, কখনো তিন ঘণ্টা। চল্লিশ মিনিট লেটকে এঁরা বলেন অন টাইম যাচ্ছে।

এই তো গেল ব্যাপার। যাওয়া-আসা করি আর ভাবি এক দিন রাজধানী চেপে রাজধানী যাব। একটু একটু ভয়ও করে। পুজো-সংখ্যায় দেখেছি চুরি ডাকাতি খুন গুম—তা-ও নাকি বাদ যায় না। গা শিরশির করে, তবু ভাবি যাবই একবার, ও-সব ব্যাপার তো অন্য লোকদের হয়, নিজেদের তো আর হয় না। ক্যায়সা গদিওলা চেয়ারে বসে সাঁই-সাঁই করে সতেরো ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল চলে যাব। থেকে থেকে বেয়ারারা ভাল ভাল খাবার জিনিস এনে দেবে। শীতের সময় শীত লাগবে না, গরমের সময় গরম লাগবে না —ঈ-ঈশ! কী মজা ভাই।

শেষটা হলও তাই। দিল্লিতে শিশু-বর্ষে শিশু-উৎসব হচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে ছোটরা

আসছে, প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার নিতে। সেখানে সেমিনার হবে, আমি লেখকদের কথা বলব।

আর আমাকে পায় কে! এর ওর কাছ থেকে ভাল চেহারার হালকা দুটো ব্যাগ বাগিয়ে, তাতে জিনিসপত্র ঠুসে ১২ নভেম্বর, সত্যি সত্যি রাজধানী এক্সপ্রেসের ৪নং কামরায় চেপে বসলাম। কী বলব ভাই, লাল গদি-আঁটা চেয়ার, বসলে ডুবে যায়! ওঠা মুশকিল। তায় আমার জায়গা জানলার পাশে দুজন মহিলাকে ডিঙিয়ে যেতে হয়। তার ওপর ঠ্যাং রাখবার জায়গা পাই না। শেষটা একটা ব্যাগ নীচে রেখে পা রাখলাম। পাশের দুজন আধবয়সী মহিলা আমাকে কোণঠাসা করে রাখলেন। ভীষণ ভাল তাঁরা।

বাড়তি লোক নামানো হল, দরজা বন্ধ হল, ঘণ্টিও নিশ্চয় পড়েছিল, শোনা যায়নি। তারপর, নীল জানলা দিয়ে দেখলাম প্ল্যাটফর্মের বইয়ের দোকান সব একসঙ্গে পিছু হটছে। আঃ কী আরাম! এবার ঢুলতে ঢুলতে খেতে খেতে সটাং নয়াদিল্লি!

আর শান্তিনিকেতনে বাড়ির লোকরা কি না বাধা দেবার তালে ছিল। ছিঃ ছিঃ। কক্ষনো অমন করতে নেই। বড়বাবুর নাকি অনিদ্রা। দিলাম ঠুসে ডবল ডোজের ঘুমের ওষুধ। মালির গলায় কাঁচা পেয়ারার মতো কী একটা ফুলে উঠল। দিলাম পাঠিয়ে কলকাতা। সবার শেষে আমাদের লোচন বলল, "আপনি গেলে কে রাঁধবে বুঝলাম না। আমি দেশে যাব ধান কাটতে!" বললাম, "ও-সব হবে-টবে না। দেখছ না, আমি রাজধানীতে রাজধানী যাচ্ছি। আমাকে বাধা-টাধা দেওয়া চলবে না।"

যাক্‌গে, গাড়ি তো ছাড়ল। একটু পরে কী ভাল গরম শিঙাড়া আর একটা ফ্লাস্কের মতো গেলাসে চা এল। বড় সাইজের মহিলাদের সঙ্গে ভাবসাব হল। তাঁরা বাংলা বলেন, কিন্তু নামে অ-বাঙালি। নিরামিষ খান। পত্রিকা পড়তে লাগলেন সবাই। আরো রাত হল। আটটা বাজল, ন'টা বাজল, রাতের গরম খাবার ঢাকনি-দেওয়া খোপ-কাটা ট্রেতে করে এল। তার চেয়েও রাত হল, প্রায় ৮০টা লোকের ঘুম পেতে লাগল, তাদের কারো বয়স ৭৫, কারো ১ মাস। কম্বল নামানো হল, হাই-টাই তোলা হল, কিছু আলো নিবল, কথাবার্তা থামল, একটু একটু নাক-ডাকানি শোনা গেল। প্রায় সবাই ঘুমোল, কিন্তু আমি আর বসে বসে ঘুমোতে পারি না, তাছাড়া ঠ্যাং দুটোকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়া গেল। দুটোর কিছুতেই একসঙ্গে আরাম হয় না! একটু একটু ঝিম ধরে, আবার উঠে বসি। গাড়ি চলেছে তো চলেইছে, শব্দ নেই, ঝাঁকানি নেই, থামা নেই, ১৩০ কি-মি বেগে ছুটে চলেছে। ওভাবে গেলে চেয়ার-টেবিলেরও ঘুম পায়। আমিও একটু ঝিমিয়ে থাকব, হঠাৎ ঘ্যাচ করে একটা ঝাঁকানি লাগল। গাড়িসুদ্ধ সবাই জেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবে গেল। তবু গাড়ি চলেছে তো চলেইছে, বরং বেগ যেন বেড়েই গেল। তবে আগে যেন তেল-মাখা রেলের ওপর সাঁই-সাঁই করে চলেছিল। এখন মনে হল কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইটপাটকেলের ওপর দিয়ে ঘড়-ঘড় ছড়-ছড় করে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে, ভীষণ বেগে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সবার গায়ের রক্ত হিম!

কিন্তু কান্নাকাটি, চেঁচামেচি নেই, গাড়ির সবাই চুপ! হয়তো আশ্চর্যের চোটে কারো মুখে কথা নেই। খালি বিড়বিড় করে ভগবানের নাম! আমার পাশের মহিলা গায়ের জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। দুজনে কাঠ হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম এভাবে তো চলতে পারে না, একটা ধাক্কাধাক্কি উল্টিপাল্টি এবার নির্ঘাত হবে! সবচেয়ে বিকট হল কামরার মধ্যে আর জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি কালি-গোলা ঘুটঘুটে অন্ধকার!

ড্রাইভার গাড়ি থামায় না কেন? নাকি পারছে না? তবু কোনো চেঁচামেচি কান্নাকাটি নেই। কে বলেছে ভারতীয়রা ভিতু! মনটাকে শক্ত কাঠ বানাচ্ছি, এমন সময় গাড়ির বেগ কমে শেষটা গাড়ি থামল। এক দিকটা মনে হল বেশ খানিকটা উঁচুতে। আমরা একটু নীচে।

কিছুক্ষণ থমথমে চুপচাপ। আলো নেই, শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই, আমরাই বা আছি কি না কে জানে! ভদ্রমহিলা তখনো আমার হাত খামচে ধরে বসে আছেন। আমি তাতে সাহস পাচ্ছি! তারপর লোকের গলায় ভাষা ফিরে আসতে লাগল। "একটু আলো! একটা টর্চ! দেশলাই। যাই হোক না কেন।" কারো কাছে কিচ্ছু নেই! রাজধানীতে ও-সব বাজে জিনিস

কে আনে! আনলেও সুটকেসের তলায় রাখে।

হঠাৎ মনে হল আমার ছোট ব্যাগে টর্চ আছে। হুক থেকে ব্যাগ নামিয়ে টর্চ বের করে জেবলে হাতঘড়িতে দেখলাম রাত তখন দুটো-দশ। আরো দুজন টর্চ বের করল। দু-তিনজন সাহস করে জায়গা ছেড়ে মধ্যিখানের প্যাসেজে বেরিয়ে এল। তাতে গাড়িটা একটু একটু টলতে লাগল।

সাহস করে একজন একটা দরজা একটু খুলেই দুম করে বন্ধ করে দিয়ে বলল, "মাই গড! গাড্ডা!" তবে আমার জানলা দিয়ে নীচে আলো ফেলে দুটো রেলের লাইন দেখতে পেলাম। মনে হল গাড়িটা একটু ট্যারা হয়ে আছে।

সেই লোকটি তখন এ-দিকের দরজা খুলে টুপ করে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচ-ছ'জন নামল। গাড়িটা টলমল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফিরে এসে বলল "আমরা একা! পেছনে কোনো গাড়ি নেই। খালি ঘুটঘুটে অন্ধকার! সামনে কিছু আছে কি না দেখতে সাহস হচ্ছে না।"

বলে কী! পৃথিবীতে একা হওয়া তো ভাল কথা নয়।

সবাই ফিরে এসে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তিনটে, চারটে। আকাশ একটু ফিকে হল, অন্ধকার পাতলা হল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে শকের চোটে যে-সব ভাষা আমি জানি না, তারো মানে বুঝতে পারছি। গুরুমুখী, গুজরাটি, উর্দু—সব। ভাবনা নেই চিন্তা নেই, বেঁচেই যখন আছি তখন ও-সব দিয়ে কী হবে!

এবার দেখা গেল দূরে মোটর রোডে গাড়ি চলছে, দু ধারে ফসল-কাটা গমের খেত, সামনে আরো তিনটে বগি, তার থেকেও লোক নামছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তখন হয়তো তিন ঘণ্টা কেটে গেছে।

এঞ্জিনে ড্রাইভার আর এঞ্জিনীয়ার ছিল। আর কেউ না। এতক্ষণ তারা জায়গা ছাড়েনি। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল। চেয়ে দেখি সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে যে-যার জায়গায় বসে পড়েছে। আর ভয় নেই। আলো আমাদের সঙ্গী। আলোর মতো আছে কী?

ছেলেরা সবাই নেমে পড়ল। এক মহিলা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাউডার মাখছিলেন, ঠোঁট মেরামত করছিলেন, বার-দুই শাড়িও বদলে-ছিলেন—তিনিও নামলেন। এঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কাঁচা খবর এল। সাবোটাজ। যখন রাত দুটো বাজে, গাড়ি ১৩০ কি-মি বেগে চলেছে, মোগলসরাইয়ের কিছু পরে পাহাড়িয়া বলে একটা খুদে স্টেশন পার হয়েছে, গাড়ির সার্চ-লাইটে ড্রাইভার দেখল, সামনে দুটো ফিশপ্লেট খোলা, স্লিপারে দড়ি বাঁধা, লাইনের পাশে মস্ত একটা ছোরা!

এ কি সত্যি না স্বপ্ন! অত বেগে ব্রেক দিলে সব গাড়ি উলটোবে। থামার জায়গাও নেই, ঐ এসে পড়ল বলে! ড্রাইভার বেগ বাড়িয়ে ১৪০ করল। ধাঁইধাঁই করে ভাঙা জায়গার ওপর দিয়ে চারটে বগি নিয়ে এঞ্জিন চলে গেল। জোড়া খুলে বাকিগুলো পেছনে পড়ে থাকল। এবং তাতেই সবাই বেঁচে গেল। এঞ্জিন তার পেছনের গাড়ি নিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে চলল, বাকিগুলোকে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বেগ কমিয়ে, ১½ কি-মি দূরে থামল। এই তো ব্যাপার। অবিশ্যি একেবারে শেষের গাড়িটা ছাড়া তারা লাইনের ওপর থাকবেই বা কেন? জোড়া-টোড়া খুলে, আলগা আলগা হয়ে লাইন থেকে সব নেমে পড়ল। আরো আলো হলে দূরে ছায়ার মতো তাদের দেখাও গেল। একটা কোচ বাঁধের গা বেয়ে খানিকটা নেমেও গেছিল।

কারো কিছু হয়নি। একটু আঁচড়-টাচড়, মাথা-ঠোকা। ঐ ঝুলো কোচটার মালপত্র দুম-দাম করে কিছু নীচে পড়েছিল। কারো বেশি লাগেনি, একটা কড়ে আঙুলও মচকায়নি, একটা জানলার কাচও ভাঙেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য, কেউ চেঁচামেচি ক্যাওম্যাও করেনি। বেঁচে আছে বলে সকলের গালভরা হাসি।

এদিকে খাবার নেই, জল নেই। তারপর রিপোর্টাররা উদয় হল, বলল টেলিফোন নম্বর দিলে আমাদের বাড়িতে খবর দেবার চেষ্টা করবে। দিয়েওছি। পেছনের স্টেশন থেকে মির্জাপুর এলাহাবাদে খবর গেছিল। আরো ঘণ্টা দেড়েক বাদে যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্ধার-গাড়ি এল। বাতাসে-চলা যন্ত্র দিয়ে আমাদের গাড়ির চাকাগুলো একে একে লাইনে তোলা হল। আমি তো হাঁ। নামতেও বলল না। শেষটা ৭

ঘণ্টা কাটলে আমাদের এঞ্জিনটা প্রথম চারটে গাড়ি টেনে নিয়ে পরের স্টেশন ঝিঙুরিতে পেঁাছল। সেখানে নাকি রিলিফ গাড়ি আসবে। আমাদের ৪নং কোচ ওখানে থাকবে। ওর তেল চোঁয়াচ্ছে! ট্রাকে করে পেছনের গাড়ির লোকদের আনা হতে লাগল। যে-যার মালপত্র বগলদাবা করে হাজির হল। কারো কিছু হারাল না।

রিলিফ গাড়ি এল। খেমো একটা প্যাসেঞ্জার। সব সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি। ভীষণ নোংরা। তাতে কী? গাড়ি তো। খচমচ করে জিনিসপত্র হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নামলাম, হাঁচড়পাঁচড় করে অন্যটাতে উঠলাম। আমার দ্রব্যাদি সহযাত্রীরা তুলে দিল। কী ভাল এই পৃথিবীর লোকেরা, বিপদে পড়লে তা টের পাওয়া যায়।

তারপর লায়ন্স ক্লাব ইত্যাদির উৎকৃষ্ট বিস্কুট এল। চা কিংবা জল ছাড়া। কোল ভরে দিয়ে গেল। কিন্তু গেলে কার সাধ্যি। গলা শুকিয়ে কাঠ। এক চা-ওয়ালাও এসে হাজির। এসেই বলল "২৫ পয়সায় হবে না, ত্রিশ লাগবে।" তাই সই। এক টাকা চাইলেও আপত্তি ছিল না। একটু একটু বিড়ির গন্ধ লাগা চা কী যে ভাল সে আর কী বলব!

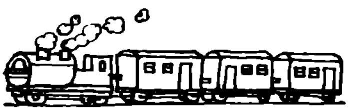
তারপর আর কী? আমাদের এঞ্জিনই তিনটে কোচ আর এই রিলিফ গাড়িগুলোকে টেনে এলাহাবাদ নিয়ে গেল। সেখানে চামড়ার মতো দুটো পুরি আর ঝাল আলুচচ্চড়ি আর ভাঁড়ের চা খাওয়া গেল। শুনেছিলাম ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি জুটবে। তার কোনো চিহ্ন না দেখে আবার একটা দু-থাক সেকেন্ড ক্লাসে চাপলাম। তখনো সকলের মুখে হাসি। সেই ফ্যাশানেবল মহিলার পাউডার-ফাউডার উঠে গিয়ে, ধুলো মেখে আমাদের থেকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। ও'র তাতে কোনো আপত্তিও ছিল না।

এটাওয়াতে গরম পুরি, আলুর দম, বরফি। কে খাওয়াল তাও জানি না। রাত দেড়টায় নিউ দিল্লি। এদিকে সবাইকে বলা হয়েছে পরে পেঁাছবে গাড়ি। যারা দূরে থাকে, তারা ৫ ঘণ্টা স্টেশনে বসে ছিল। ভোর অবধি বসার জন্য তৈরি হয়ে। যারা তত দূরে নয় তারা ফিরে গেছিল। তাতে আমার হয়ে গেল মুশকিল। কিন্তু আমার সঙ্গিনী সেই বড় মাপের মহিলা, তাঁর মনটাও দেখলাম শরীরের চেয়েও বড়। ত'ার স্বামীরও। আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়িতে। সেখানে পেঁাছে অবিশ্যি যে জিনিসটার বিরুদ্ধে ১ বছর বয়স থেকে লড়াই করেছি, তাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন অর্থাৎ বড় এক গেলাস দুধ খাওয়াবার। বলাবাহুল্য, পরাজয় স্বীকার করলেন।

আমি ও'দের লেপ গায়ে দিয়ে ও'দের খাটে ঘুমোলাম, ও'রা নীচে শুলেন। বলিনি পৃথিবীর লোকেরা যে কত ভাল তা বলা যায় না! পরদিন ভোরে বাড়িতে ফোন করা হল। তারা এসে আমাকে মাথায় করে নিয়ে গেল। কিন্তু ঐ অচেনা মানুষ দুটির আদরের সঙ্গে যে কোনো কিছুর তুলনা হয় না তাতে সন্দেহ নেই।

এই তো গেল আমার দিল্লি আসার গল্প।

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত



তোমরা কি কিংকং সিনেমা দেখেছ? না দেখলে বড়দের কাছে শুনে নিও। কিংকং হল বিরাট দৈত্যাকায় এক গোরিলা। ৫০ ফুট লম্বা, বুকের ছাতি ৩৬ ফুট। ৬ই ফুট চওড়া মুখ, তাতে ১০ ইঞ্চি লম্বা দাঁত, আর ১ ফুট লম্বা কান। কিংকং যে মেয়েটিকে হাতের মুঠোয় ধরে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মাথায় উঠেছিল, তাকে মনে হচ্ছিল একটা ছোট্ট খেলনা পুতুল। এই কিংকঙের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিল জানো? ৩০টা ভাল্লুকের ছাল দিয়ে তৈরি এই অতিকায় জন্তুটির টেনিস - বলের সাইজের চোখদুটি কাচের, নাকটা রবারের, আর শরীরের মধ্যে বসে ৬টি মানুষ। তারা ৪৫টি মোটর চালিয়ে কিংকংকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছে।



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবু আর সন্তু এবার অভিযানে এসেছে হিমালয়ে। গোরখশেপ নামে একটা জায়গায় একটা গম্বুজের মধ্যে ওরা থাকে। একদিন সামনের দিকে এগোতে গিয়ে ইয়েতির মতন বিশাল কোনো প্রাণীকে এক পলকের জন্য দেখে শেরপা আর মালবাহকরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু আর সন্তু আবার সেই গম্বুজের মধ্যে আশ্রয় নিলে কে বা কারা যেন বাইরে থেকে গম্বুজের দরজা বন্ধ করে দেয়। কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠালে রানা আর ভার্মা নামে দু-জন অফিসার হেলিকপ্টারে করে এসে ওদের উদ্ধার করেন। তারপর কাকাবাবু ওদের দু-জনকে নিয়ে রহস্যের সন্ধানে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার সময় সন্তু একবার পেছন ফিরে দেখতে পেল একজন লোক ওদের দিকে ছুটে আসছে। তারপর—]

॥ ১৩ ॥

নীল কোট পরা লোকটা দুহাত তুলে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ঠিক ছুটতে পারছে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে বরফের ওপর দিয়ে। রানা আর ভার্মা লাইট মেশিনগান উঁচিয়ে আছেন লোকটির দিকে।

আর একটু কাছে আসতেই দেখা গেল, লোকটি মিংমা।

কাকাবাবু বললেন, "এ তো আমাদের একজন শেরপা!"

সন্তু বলল, "আমি আগেই চিনতে পেরেছিলাম।"

মিংমা কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল, "সাব!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? রাস্তায় তোমাদের কোনো বিপদ ঘটেছে? ফিরে এলে কেন?"

মিংমা বলল, "সাব, আমি মাফি মাঙতে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর আমার দিলের মধ্যে বহুত দুখ্ হচ্ছিল। আমি জবান দিয়েছিলাম আপনাদের সঙ্গে যাব, শেরপা কখনো জবান নষ্ট করে না, কখনো ভয় পায় না।"

জং বাহাদুর রানা মিংমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে নেপালি ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবার কেন ফিরে এসেছ, সত্যি করে বলো? যদি কোনো মতলব থাকে—"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "যাক, এখানে আর কোনো নাটক করার দরকার নেই। মিংমা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও? তুমি না যেতে চাইলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি যেতে চাও তো আসতে পারো।"

মিংমা বলল, "সাব, আমি আর আপনাদের সঙ্গ ছাড়ব না। আপনাদের জন্য আমি জান্ দিতেও তৈয়ার। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর, আজ সকালে আমার মন বলল, ওরে মিংমা, তুই এ কী করলি? একজন গোঁড়া বাঙালি ভয় পেল না, আর তুই শেরপার বাচ্ছা হয়ে জানের ডরে ভেগে এলি? ছিয়া ছিয়া ছিয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি কথায় সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। চলো, তাহলে এগোনো যাক!"

মিংমা কাকাবাবুর কাঁধের হ্যাভারস্যাকটা প্রায় জোর করেই নিজে নিয়ে নিল। তারপর বলল, "আংকেল সাব, আপনাদের যদি হাঁটতে কষ্ট হয়, তা হলে এই মিংমা আপনাকে কাঁধে করেও নিয়ে যেতে পারে।"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "আবার বেশি কথা বলছ! এগোও! তোমরা সামনে সামনে চলো।"

মিংমাকে পেয়ে সন্তু খুব খুশি। মিংমার মতন হাসিখুশি, ছটফটে মানুষটি যে ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে পালাবে, এটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সে মিংমার পাশে-পাশে চলতে-চলতে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কতদূর চলে গিয়েছিলে?"

মিংমা বলল, "সে-কথা যাক, সন্তু সাব। ও কথা ভাবতেই আমার সরম্ লাগছে। কাল রাতে তোমাদের কোনো বিপদ হয়নি তো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দারুণ বিপদ। কারা যেন আমাদের গম্বুজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বাইরে থেকে।"

মিংমা দারুণ অবাক হয়ে বলল, "সে কী? এখানে কে দরজা বন্ধ করবে? আপনা আপনি দরজা টাইট হয়ে যায়নি তো?"

জং বাহাদুর রানা জিজ্ঞেস করলেন, "দরজা বাইরে থেকে লোহার পাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। ইয়েটি তো এরকমভাবে দরজা বন্ধ করতে পারে না! তা হলে কে করেছিল? তোমরা করোনি তো?"

মিংমা চোখ গোল গোল করে বলল, "আমরা? কেন, আমরা দরজা বন্ধ করব?"

রানা বললেন, "সাহেবদের মেরে ফেলতে পারলেই তো তোমাদের সুবিধে ছিল! তা হলে আর কেউ তোমাদের নামে দোষ দিতে পারত না?"

মিংমা বলল, "আমি পশুপতিনাথজীর নামে কিরিয়া কেটে বলছি, ওরকম কাজ আমরা কক্ষনো করি না। তাছাড়া, কাল রাতে আমরা বহুত দূরে ছিলাম!"

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি সত্যিই ইয়েতি দেখেছ?"

মিংমা বলল, "ইয়েটি ছিল কিংবা আউর কুছ ছিল, কেয়া মালুম! লেকিন একটা বহুত বড়া জানোয়ারকা মাফিক কুছ দেখা!"

"ঠিক জায়গাটা দেখেছিলে?"

"ঐ যে সামনে কালাপাথ্থর নামে পাহাড়টা দেখছেন, ঠিক ওর নজদিগে!"

"আমাদের সেই জায়গাটা দেখাতে পারবে?"

"হাঁ সাব!"

"আমরা তা হলে এখন ঐ জায়গাটা পর্যন্ত যাব! কী বলেন, মিঃ রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, দূর থেকে বললেন, "হ্যাঁ। আপনারা এগিয়ে যান।"

ভার্মা বললেন, "আমরা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছি আপনার জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমি ঠিক ধরে ফেলব আপনাদের। জানেন তো, স্লো অ্যান্ড স্টেডি, উইনস দা রেস!"

রানা বললেন, "তা ঠিক। আপনার বেশি কষ্ট করার দরকার নেই, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আস্তে-আস্তে আসুন!"

কাল সারা রাত তুষারপাতের জন্য খুব পাতলা ঝুরো-ঝুরো বরফ জমে আছে চারদিকে। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো গেঁথে যাচ্ছে সেই বরফে। সেই জন্য হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু নিজের অসুবিধের কথা কারুকে জানতে দিতে চান না তিনি।

রোদ্দুরের তাপে এক-এক জায়গায় বরফ গলে জল হয়ে আছে। সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। জং বাহাদুর রানা একবার আছাড় খেয়ে পড়তেই মিংমা গিয়ে তাঁকে টেনে তুলল। তারপরই পড়লেন ভার্মা। কাকাবাবু কিন্তু একবারও আছাড় খেলেন না। সকলের থেকে খানিকটা পেছনে তিনি আসতে লাগলেন খুব সাবধানে, পা টিপে-টিপে।

সন্তু পাতলা শরীর নিয়ে বেশ এগিয়ে



যাচ্ছে তরতর করে। আকাশ আজ খুবই পরিষ্কার। এই রকম দিনে এভারেস্টের চূড়া দেখা যায়। কালাপাথর পাহাড়টার জন্য এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে। সন্তু এখানে এসে কয়েকবার এভারেস্টের চূড়া দেখেছে, তার নিজের ক্যামেরায় ছবিও তুলেছে। তবু আর-একবার দেখতে পাবে বলে উত্তেজনা জাগছে তার শরীরে। বিশাল মহান কিছুর কাছাকাছি এলেই মানুষ একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

মিংমা পেছন থেকে এসে সন্তুর হাত চেপে ধরে বলল, "সন্তু সাব, অত সামনে-সামনে যেও না! ঐ দুই বড়া সাবদের আগে যেতে দাও!"

সন্তু বলল, "কেন?"

"যদি ইয়েটি এসে তোমায় আগে ধরে নিয়ে যায়।"

সন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। এর মধ্যে ইয়েতির কথা সে ভুলে গিয়েছিল। আবার মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে উঠল তার বুক।

জোর করে সাহস এনে সে বলল, "দু'খানা এল এম জি আছে আমাদের সঙ্গে। ইয়েতি কী করবে?"

মিংমা ফিশফিশ করে বলল, "সন্তু সাব, ইয়েটি ভ্যানিশ করে যেতে পারে!"

সন্তু খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, "যাঃ!"

"আমিও আগে মানতাম না। লেকিন নিজের আঁখসে তো দেখলাম কাল। এক দো সেকেন্ড ছিল, তারপরই ভ্যানিশ করে গেল। কেয়া ঠিক নেহি!"

সন্তু বলল, "হুঁ!"

সন্তু সেই কালো-মতন বিরাট প্রাণীটাকে এক পলকের জন্য দেখেই ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর যখন আবার তাকিয়েছে, সেটা আর নেই। অত তাড়াতাড়ি কোথায় পালাল? সত্যি কি কোনো প্রাণী অদৃশ্য হতে পারে?

মিংমা সন্তুকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল। ভার্মা আর রানা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন, ওঁরা এগিয়ে এলেন। সন্তুর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু রানা আর ভার্মার অসুবিধে হচ্ছে বেশ। একবার করে আছাড় খেয়ে ওঁরা বেশি সাবধান হয়ে গেলেন। দু'জনের হাতেই লাইট মেশিনগান, নামে লাইট হলেও খুব হালকা তো নয়!

ভার্মা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! এখানেই ইয়েতি দেখেছিলে নাকি?"

সন্তু বলল, "না, আরও অনেক দূরে আছে!"

"আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলো। যদি সত্যিই ইয়েতি দেখতে পাই, গুলিতে তাকে একেবারে ফুঁড়ে দেব! জ্যান্ত হোক, মরা হোক, একটা ইয়েতি নিয়ে যদি দেখাতে পারি, তা হলে সারা পৃথিবীতে আমাদের নাম ছড়িয়ে যাবে! এ পর্যন্ত কেউ ইয়েতির



অস্তিত্ব ঠিক ভাবে প্রমাণ করতে পারেনি!"

রানা বললেন, "এই ছেলেটি নিজের চোখে দেখেছে বলছে, একে অবিশ্বাসই বা করা যায় কী করে! শেরপা কিংবা কুলিদের নাহয় কুসংস্কার থাকতে পারে—"

ভার্মা বললেন, "আর এক যদি কোনো ভাল্লুক-টাল্লুকের মতন জানোয়ার দেখে থাকে..."

রানা বললেন, "এখানে ভাল্লুক আসবে কোথা থেকে? এ পথ দিয়ে কত অভিযাত্রী গেছে, কেউ কোনো দিন কোনো ভাল্লুক দেখেনি।"

ভার্মা বললেন, "কেউ তো আগে ইয়েতিও দেখেনি!"

রানা বললেন, "কেইন শিপ্‌টন দেখেছিলেন। অন্তত তাঁর ডায়েরিতে সেই কথা লেখা আছে। আমার মনে হয়, তিব্বতের দিক থেকে ইয়েটিই হোক বা অন্য কোনো বড় জানোয়ারই হোক, এদিকে ছিট্‌কে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুও পায়ের ছাপ দেখেছেন। মোটেই ভাল্লুকের মতন নয়, মানুষের মতন। তবে, চারটি আঙুল।"

ভার্মা বললেন, "তাও বটে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ভার্মা সাহেব, আপনি এরকম ভাল বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?"

ভার্মা হেসে বললেন, "আমি তো কলকাতায় লেখা-পড়া করেছি। আমি থাকতুম হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে। তোমাদের বাড়ি তো ভবানীপুর, তাই না? সে জায়গাও চিনি।"

রানা বললেন, "আমি পড়েছি দার্জিলিঙের নর্থ পয়েন্ট স্কুলে। আমার অনেক বাঙালি বন্ধু ছিল। কলকাতায় বালিগঞ্জে আয়রন সাইড রোড আছে, সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে আমি দু' তিনবার থেকেছি।"

মিংমা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সাব্, দেখিয়ে।"

তিনজনেই চমকে গিয়ে মিংমার দিকে তাকাল। মিংমা সামনে বরফের মধ্যে এক জায়গার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আছে।

সেখানে একটা মস্ত বড় পায়ের ছাপ।

ভার্মা আর রানা সেখানে বসে পড়লেন। সন্তু পেছন ফিরে কাকাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাকাবাবুকে দেখতে পেল না।

ভার্মা বলল, "একটা মাত্র পায়ের ছাপ? নিশ্চয়ই টাটকা, কারণ কাল রাত্তিরে তুষারপাত হয়েছিল, তার আগের হলে মিলিয়ে যেত!"

রানা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক এখানে। আরে—, মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ভার্মা বললেন, "কোথাও বসে বিশ্রাম করছেন বোধহয়।"

সন্তু বলল, "বরফ তো উঁচু-নিচু নয়, কোথাও বসলেই বা দেখতে পাব না কেন? বেশি দূরে তো ছিলেন না!"

ভার্মা বললেন, "হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি তো? ফিরে গিয়ে আমাদের একবার দেখা দরকার।"

রানা বললেন, "কিন্তু এখানে হঠাৎ এই একটা পায়ের ছাপ এল কী করে?"

তিনি এল এম জি-টা উঁচিয়ে একবার চারদিকে ঘুরে তাকালেন।

মিংমা খুব জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, "আংকল সাব! আংকল সাব!"

কোনো উত্তর এল না।

সন্তু বলল, "আমি কাকাবাবুকে খুঁজে আসছি!"

ভার্মা বললেন, "আমি আর মিঃ রানা এখানে থাকছি, তুমি আর মিংমা দেখে এসো। উনি আহত হয়ে থাকলে আমাদের ডেকো।"

সন্তু মাঝে-মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে কাকাবাবুর প্রতি লক্ষ রাখছিল। কাকাবাবু কখনো চোখের আড়াল হননি। দুশো আড়াই শো গজ দূরে ঠুক-ঠুক করে আসছিলেন। ভার্মা আর রানার সঙ্গে কথা বলার সময় সন্তু কাকাবাবুর দিকে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল। এরই মধ্যে কাকাবাবু কোথায় গেলেন!

খানিকটা ফিরে এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সন্তু প্রায় কেঁদে উঠে বলল, "মিংমা!"

মিংমাও একই সঙ্গে দেখতে পেয়েছে।

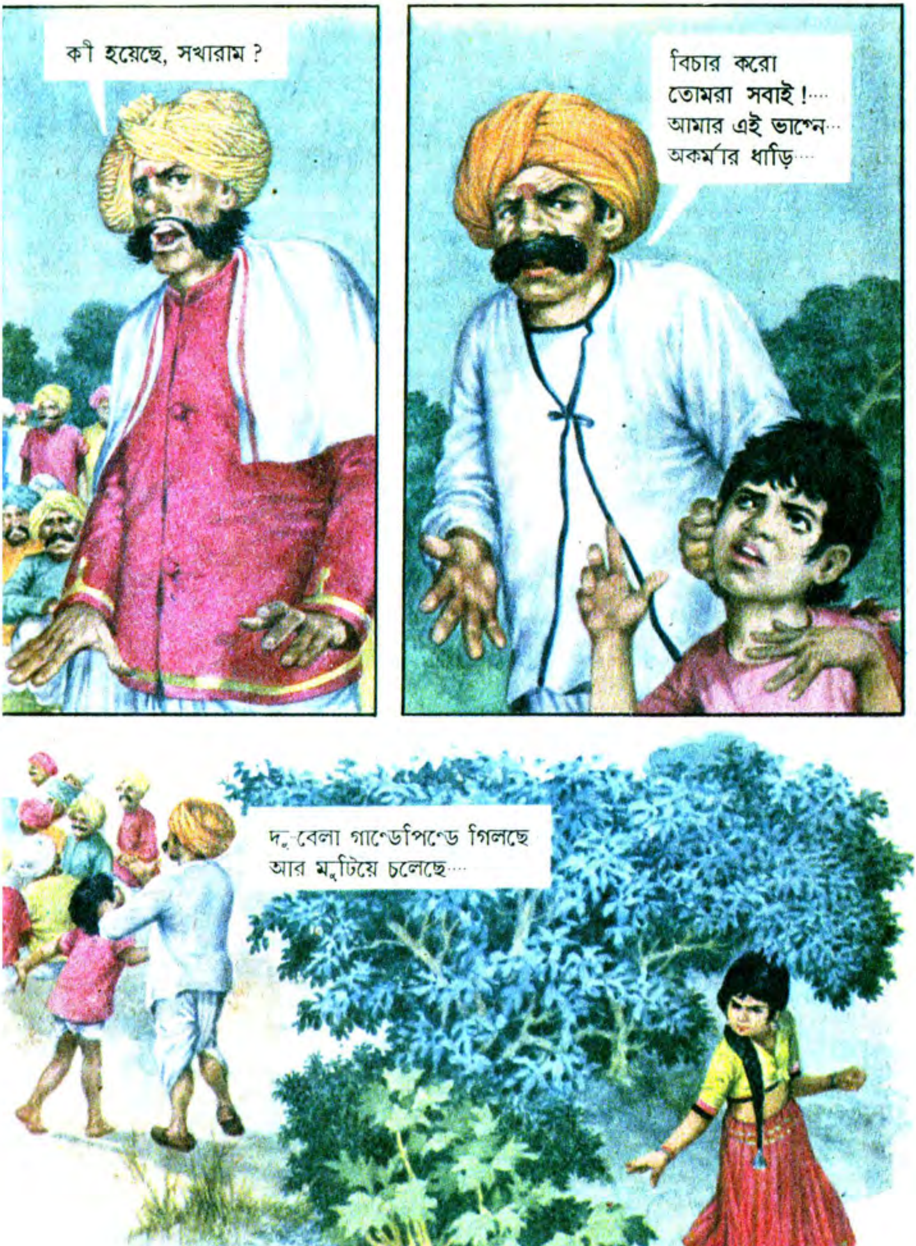
বরফের ওপরে পড়ে আছে কাকাবাবুর একটা ক্রাচ আর খানিকটা টাট্‌কা রক্ত। আর কিছু না। (ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

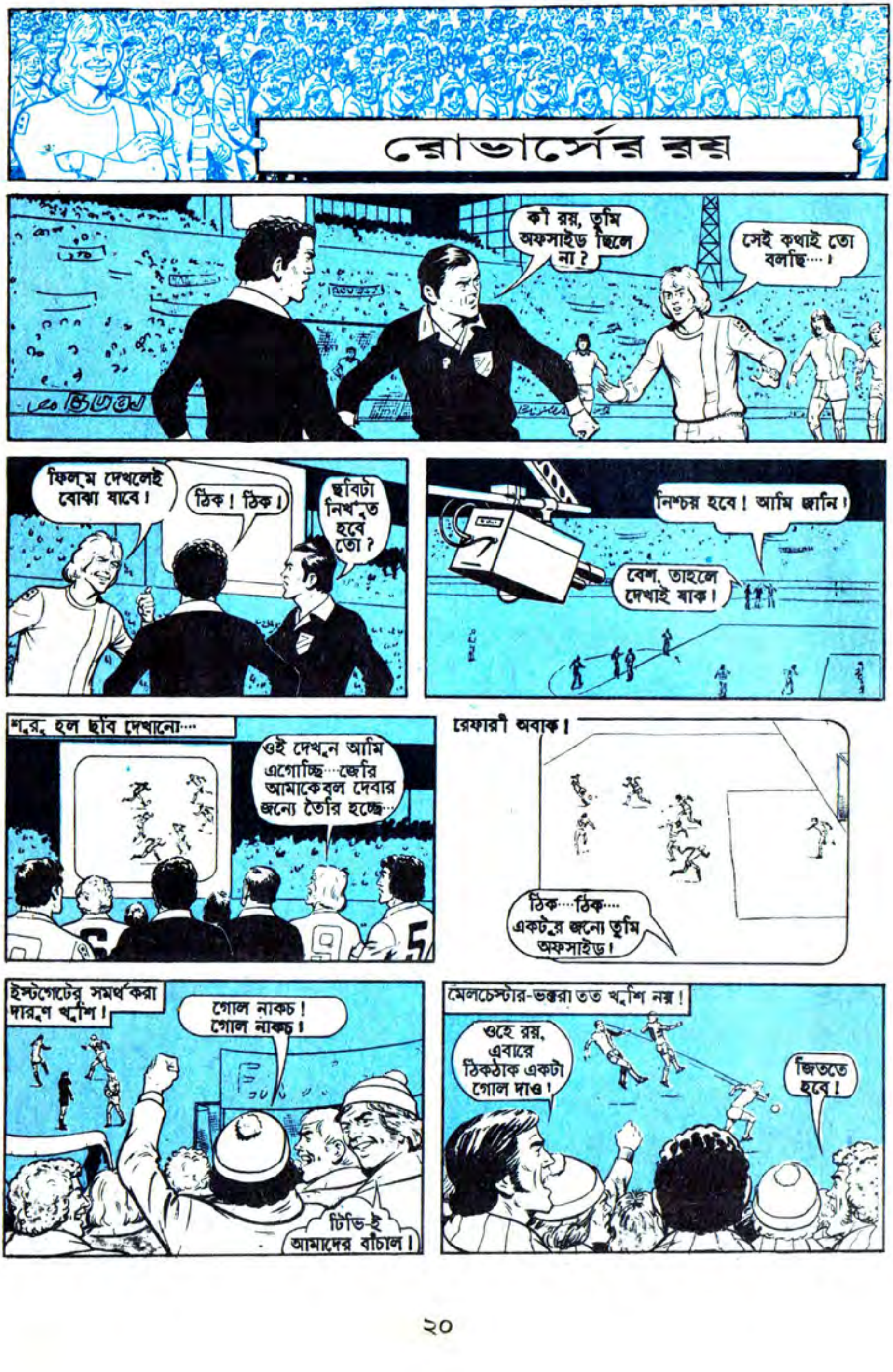
সদাশিব

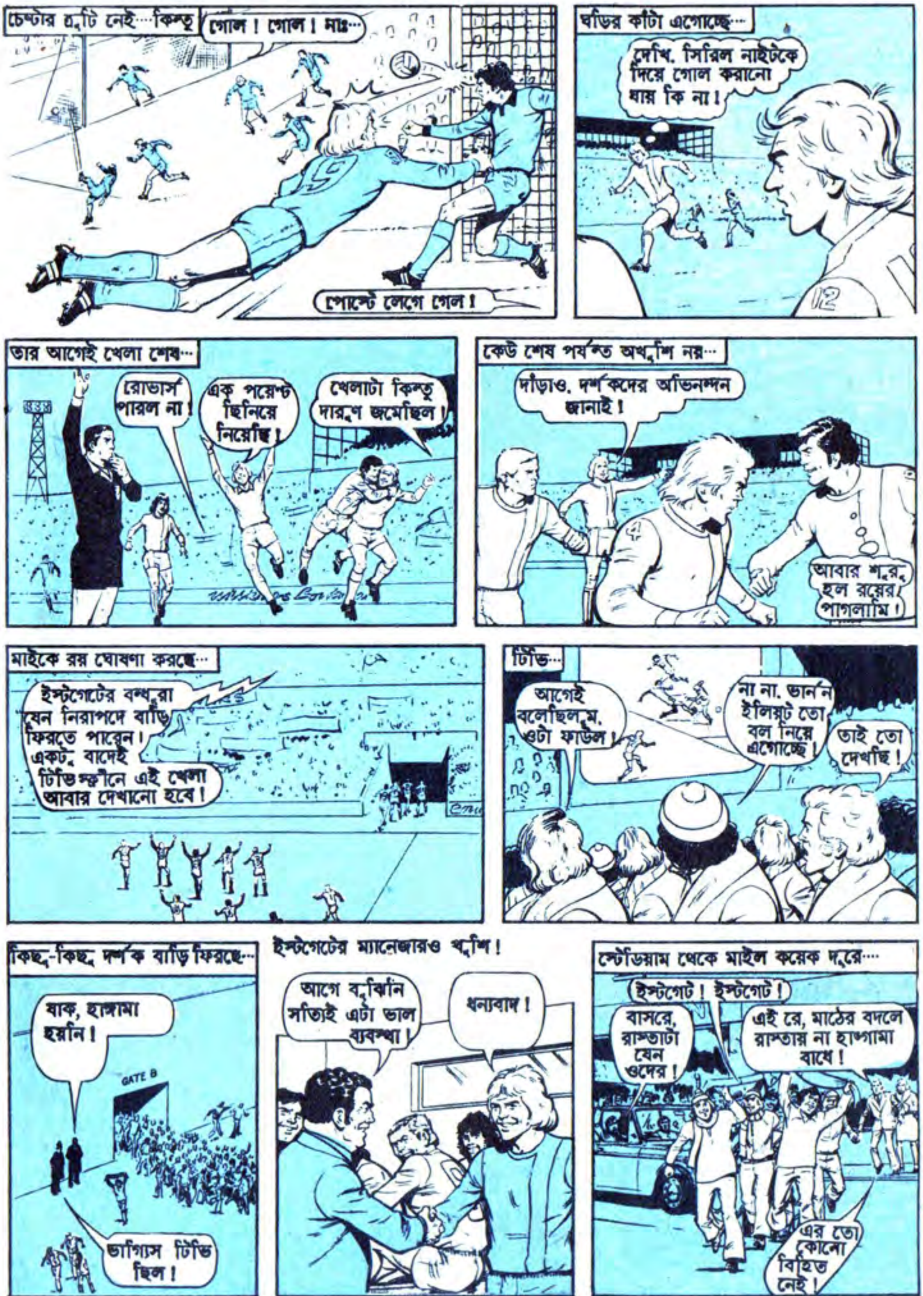
আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

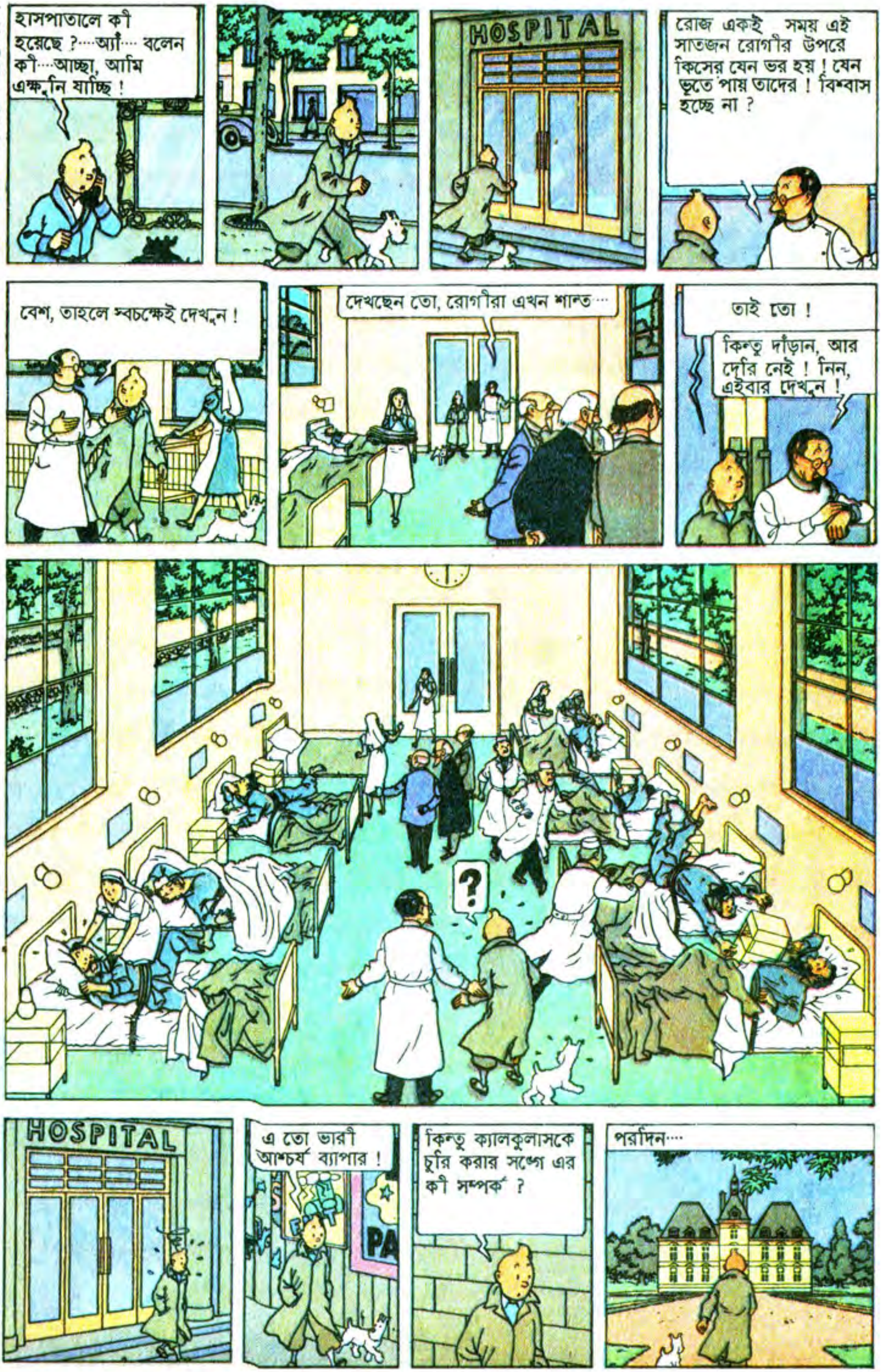


(এর পরে ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


রোভার্সের রয়
কী রয়, তুমি অফসাইড ছিলে না?
সেই কথাই তো বলছি…।
ফিল্ম দেখলেই বোঝা যাবে।
ঠিক! ঠিক।
ছবিটা নিখুঁত হবে তো?
নিশ্চয় হবে! আমি জানি।
বেশ, তাহলে দেখাই যাক!
শুরু হল ছবি দেখানো…
ওই দেখুন আমি এগোচ্ছি…জেরি আমাকে বল দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে…
রেফারী অবাক!
ঠিক…ঠিক… একটুর জন্যে তুমি অফসাইড।
ইস্টগেটের সমর্থকরা দারুণ খুশি!
গোল নাকচ! গোল নাকচ!
টিভি-ই আমাদের বাঁচাল!
মেলচেস্টার-ভক্তরা তত খুশি নয়!
ওহে রয়, এবারে ঠিকঠাক একটা গোল দাও!
জিততে হবে!

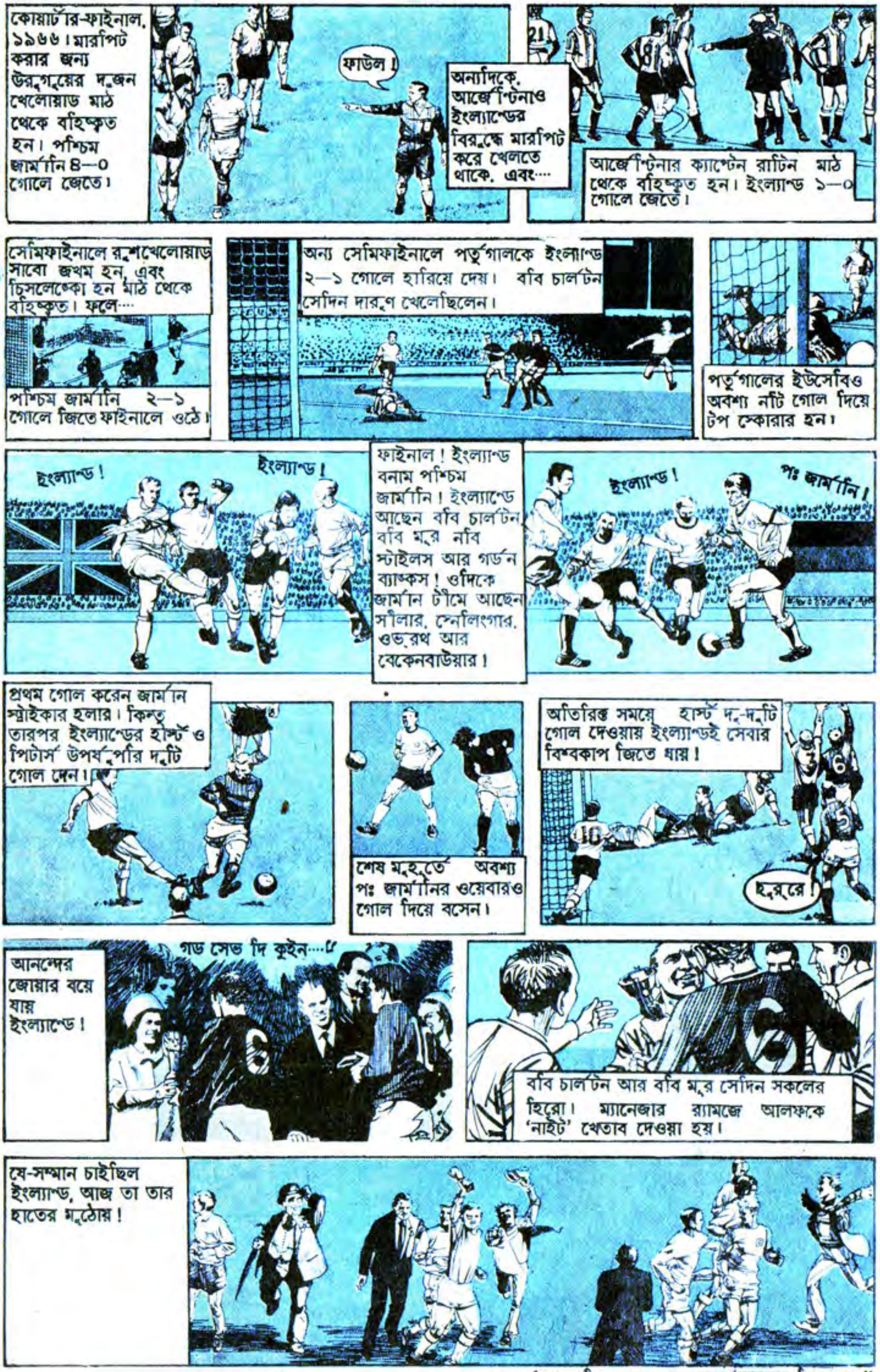


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


হাসপাতালে কী হয়েছে ?····অ্যাঁ···· বলেন কী····আচ্ছা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি !
HOSPITAL
রোজ একই সময় এই সাতজন রোগীর উপরে কিসের যেন ভর হয় ! যেন ভূতে পায় তাদের ! বিশ্বাস হচ্ছে না ?
বেশ, তাহলে স্বচক্ষেই দেখুন !
দেখছেন তো, রোগীরা এখন শান্ত····
তাই তো !
কিন্তু দাঁড়ান, আর দেরি নেই ! নিন, এইবার দেখুন !
?
HOSPITAL
এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার !
কিন্তু ক্যালকুলাসকে চুরি করার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?
পরদিন····



(এর পর আগামী সংখ্যায়)



(আগামী সংখ্যায় শুরু হবে 'সত্তরের বিশ্বকাপ')

পলটু-মামা

আদিনাথ নাগ

ধুত্তেরি তোর বকুনি থামা,
খাস তো মুড়ি একটি ধামা।
শুনত যদি পলটু-মামা,
পেটটা হেসেই ফাটত।

এ-মামা নয় রামা-শ্যামা,
খাতির করেন গোবর-গামা।
হাওড়া থেকে সেই মোকামা
সকাল-বিকাল হাঁটত।

দেখতে মামার খাওয়ার বহর
যেদিন ভেঙে পড়ল শহর,
মামা খেল ঝিনাইদহর
লঙ্কা বারো বস্তা।

সবাই বলে, 'কাণ্ড কী এ!'
হাসল মামা ঠোঁট বেঁকিয়ে,
বলল, 'সেদিন পোস্তা গিয়ে
পেয়ে গেলাম শস্তায়।'

ছবি দেবাশিস দেব





ওয়ান-টু

মুস্তাফা নাশাদ

ওয়ান-টু কা-কা-কা
আয় রে কাক খেয়ে যা,
আদা দেওয়া গরম চা।

ওয়ান-টু বা-বা-বা
আমার মতো কাপে খা,
সোফা সেটে ছড়িয়ে পা।

ওয়ান-টু না-না-না!
কেন রে কাক খাবি না?
পয়সা দিয়েও পাবি না।

ওয়ান-টু ফো-ফো-ফোর—
ঢুকলে বাড়ি বলবে চোর!
পাড়া-পড়শি তুলবে শোর?

ওয়ান-টু চা-চা-চা—
খাবি না তো উড়ে যা।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিসের হাতে আটক বেহুঁশ ছেলেটিকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চান্দৌলির এক মন্দির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর—

॥ ১০ ॥

সুপারিনটেনডেণ্ট মশাই অনেকক্ষণ পুরনো খাতাগুলো খুঁজে দেখতে লাগলেন। তারপর যখন সমস্ত খাতা খোঁজা হয়ে গেল তখন বললেন, 'না, আমাদের এখানে ও-নামে কেউ ছিল না।'

চন্দ্রভানুবাবু আর কী করবেন। তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর মনে সামান্য একটু আশা ছিল, তাও নির্মূল হয়ে গেল। তিনি হাসপাতালের বাইরে চলে এলেন। তাঁকে আবার ট্রেন ধরে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। সেই মতিহারি। মালদা জেলার পৈতৃক বাড়ি থেকে সেই যে পালিয়ে গিয়েছিলেন তারপর থেকে নানান ঘাটের জল খেয়ে ঠেকেছেন গিয়ে সেই মতিহারিতে। কী ভাবে যে তিনি মতিহারিতে গিয়ে আস্তানা গাড়লেন সে এক ইতিহাস। প্রথমে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গরুর গাড়িতে—আবার কখনও বা বাসে চড়ে। শেষকালে সাধুজি বললেন, 'এবার তুই সংসার কর গিয়ে।'

চন্দ্রভানুবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথায় যাব? আমি তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি—'

সাধুজি বলেছিলেন, 'তোর যেখানে খুশি সেখানেই যা—তোর এখন সংসার-যোগ আছে!'

'সংসার-যোগ?'

'হ্যাঁ।'

আমি কি তাহলে বিয়ে করব? বিয়ে না করলে কি কারো সংসার হয়?'

'হ্যাঁ, হয়। তোর বিয়েও হবে। কিন্তু তোর বউ বেশিদিন বাঁচবে না। তবু তোকে সংসার করতে হবে। তোর অনেক টাকার যোগ আছে কপালে।'

'কিন্তু বউই যদি মারা যায় তাহলে অত টাকা নিয়ে আমি কী করব।

সাধুজি বলেছিলেন, 'তোর একটা ছেলে হবে।'

'ছেলে? ছেলে হবার পর কি বউ মারা যাবে?'

'না, বউ মারা যাবার পর তোর ছেলে হবে।'

'সে কী-রকম?'

'তোর কপালে অনেক ভোগ আছে এখনও। অনেক দুর্ভোগ আছে। সেই দুর্ভোগ আছে বলেই ছেলে থাকা তোর দরকার। সেই ছেলের জন্যেই তোকে অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।'

এর পর আর সাধুজি কিছু বলেননি। বলতে চানও নি। সেই দিন থেকেই চন্দ্রভানুবাবুর ছাড়াছাড়ি। চন্দ্রভানুবাবু একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওই মতিহারিতে এসে হাজির। সেখানে একদিন ঠিকেদারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কাজ করতে করতে একদিন নিজেই ঠিকেদার হয়ে বসেছিলেন। ঠিকেদারি করতে করতে যখন একদিন খুব টাকা হল তখন একদিন বিয়েও করে বসলেন। কিন্তু সাধুবাবা যা বলেছিলেন সব মিলে গেল। বউটা একদিন সামান্য একটা অসুখে মারা গেল। তখন অনেক টাকা হয়ে গিয়েছে তাঁর। টাকা হয়েছে বটে কিন্তু সে টাকা খাবার লোক কেউ নেই। ভাবতেন একটা ছেলে থাকলে ভাল হত। কিন্তু কোথায় পাবেন ছেলে? আবার বিয়ে করলে হত, কিন্তু সাধুজির কথা মনে পড়ে গেল। বিয়ে করার কথা আর ভাবলেন না। তবে কেউ যদি একটা ছেলে তাঁকে দিত তো ভাল হত। সে-চেষ্টাও যে তিনি করেননি তা নয়। কিন্তু কে দেবে তেমন ছেলে? আর

যাকে-তাকে তো ছেলে করে নেওয়া যায় না। দেখতে-শুনতে ভাল, বুদ্ধিমান সৎ বংশের ছেলে হওয়া চাই।

তারপর নিজের ঠিকেদারির কাজেই সেবার কলকাতায় যেতে হয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনের দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা নধর হৃষ্টপুষ্ট ফর্সা ছেলে পার্কের মধ্যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বল খেলেছে। দেখে বড় ভাল লাগল তাঁর। ওই রকম একটি ছেলে যদি তাঁর থাকত তাহলে তিনি একটু শান্তি পেতেন। তাঁর বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। শুধু সংসারই হয়নি। তাঁর সংসার করবার কত সাধ ছিল। হঠাৎ বউ মারা গেল। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে অনেকক্ষণ দেখতে লাগলেন। তারপর সুযোগ পেয়ে ছেলেটার সঙ্গে ভাব করলেন। ছেলেটার সঙ্গে একজন চাকর ছিল। সে অন্য চাকর-দের সঙ্গে তখন গল্প করছে। সেই ফাঁকে ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন, 'খোকা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?'

ছেলেটি বললে, 'কোথায় ? অনেক দূরে ?'

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক দূরে।'

ছেলেটি বললে, 'অনেক দূরে না নিয়ে গেলে কিন্তু আমি যাব না।'

'অনেক দূরে কোথায় যাবে ?'

'আকাশে। যেখানে পাখিরা ওড়ে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি আকাশে নিয়ে যাব, চলো—'

তারপর বললেন, 'দাঁড়াও, তার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে যাই।' বলে ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে তাতে একটি চিঠি লিখে-পার্কের মালির হাতে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে চলে গিয়ে-ছিলেন। আর তারপর সেই ট্রেনের অ্যাক্সিডেন্ট।

তারপর নিজে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কত জায়গায় ঘুরেছেন, কত খবর নিয়েছেন। কোথাও তার খোঁজ পাননি। শেষকালে হতাশ হয়ে আবার ফিরে এলেন মতিহারিতে। মতিহারিতে তাঁর বিরাট বাড়ি, বিরাট কারবার। অনেক লোক কাজ করে তাঁর কাছে। তিনি সকলের সংসার বানিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নিজেরই সংসার নেই।

চন্দ্রভানুবাবুকে আসতে দেখে ম্যানেজার হাজির হল।

ম্যানেজার বললে, 'এই ফাইলটা একবার দেখবেন স্যার, অনেকদিন দেখেননি—'

চন্দ্রভানুবাবুর মন ভাল ছিল না। কেবল ফাইল আর ফাইল। আর ভাল লাগে না ফাইল দেখতে। কার জন্যে তিনি ফাইল দেখবেন। কার জন্যে তিনি আর টাকা উপায় করবেন ? কে আছে তাঁর ? সেই সাধুর কথাই কি তাহলে ফলে গেল ? এই ছেলেটার জন্যেই কি তাহলে তাঁর যত দুর্ভোগ হবে ?

কলকাতার বাড়িতে তখন জয়রামবাবু খুব ব্যস্ত। ব্যস্ততা জ্যোতিষ্ককে নিয়ে। জ্যোতিষ্কের জন্যে সকালে বিকেলে ডাক্তার আসে। এসে তাকে পরীক্ষা করে যায়। জয়রামবাবু বলে দিয়েছেন যত টাকা লাগে জ্যোতিকে ভাল করে দিতে।

যত রাগ তাঁর গোপালের ওপর। বলেন, 'তোর জন্যেই আমার জ্যোতির এই অবস্থা। তুই আমার সামনে থেকে বেরো।'

গোপাল এ-কথার প্রতিবাদ করে না। সত্যিই তারই দোষ ছিল। সে যদি পার্কের অন্য চাকরদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে না থাকত তাহলে এমন হত না।

ডাক্তারবাবু এলেই জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'কী রকম দেখছেন। একটু উন্নতি হচ্ছে ?'

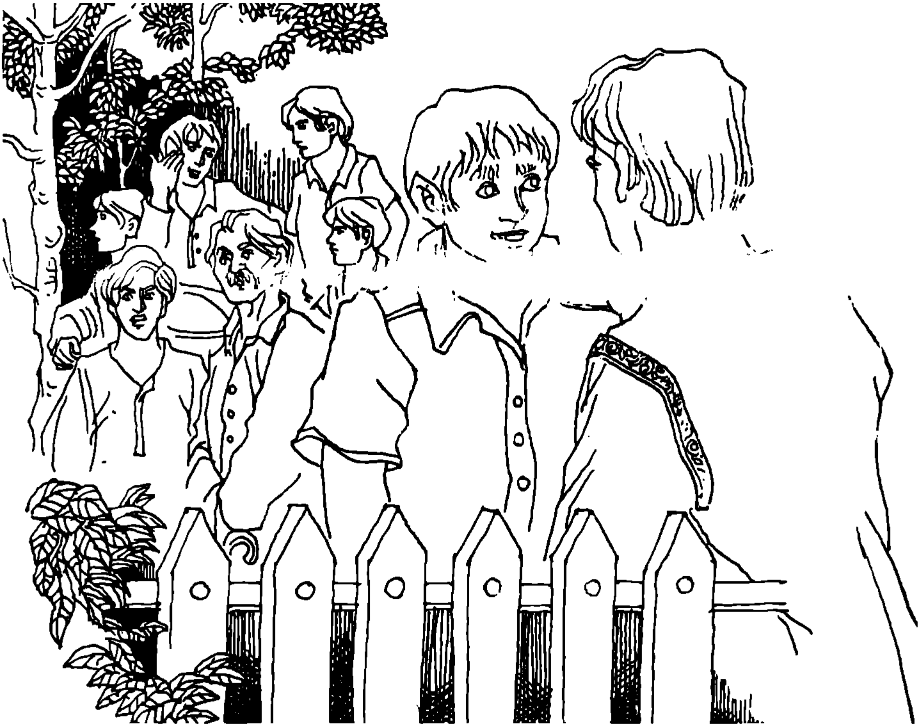
ডাক্তারবাবু বলেন, 'উন্নতি হচ্ছে কি না আপনি বুঝতে পারছেন না ? এখন তো আর আগেকার মতন এলোমেলো কথা বলে না। বলে কি ?—'

জয়রামবাবু বলেন, 'না, এখন তো একটু একটু বুঝতে পারে সব। কিন্তু একেবারে পুরো ভাল হতে কত দিন লাগবে ?'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'তা সময় একটু লাগবে বই কি ? এতদিন কত বিষ পেটে ঢুকেছে, ও কি একদিনে যাবার ?'

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'তবু একে-বারে পুরো সারতে আরও কতদিন লাগবে ?'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'তা ধরুন আরও এক বছর। ততদিন আপনি ওকে একটু



পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে থাকুন!'

'পুষ্টিকর খাবার বলতে আপনি কোন্ কোন্ খাবার বলতে চান ?'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'পুষ্টিকর খাবার মানে মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, দুধ—এই সব আর-কি !'

জয়রামবাবু বলেন, 'ও-সব খাবার তো রোজই খাওয়াচ্ছি। রোজ ওকে দুটো করে ডিম, আধ সের করে খাঁটি দুধ, ভাতের সঙ্গে একটু ঘি, তারপরে দই ছানা, মাংস সপ্তাহে একদিন আর রোজ একশো গ্রাম করে পাকা পোনা। এর ওপর আপনি যে ভিটামিন ওষুধ দিয়েছেন, তাও খাওয়াচ্ছি—'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'বাস বাস, যথেষ্ট। দেখবেন, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে ও, আপনি বেশি ভাববেন না।'

বলে ডাক্তারবাবু চলে যান। তারপর বিনয় জ্যোতিকে পড়াতে আসে। যেমন আগে আসত।

জয়রামবাবু তাকেও জিজ্ঞেস করেন, 'জ্যোতি আজকাল কেমন লেখাপড়া করছে মাস্টার ? কী-রকম বুঝছ ?'

বিনয় বলে, 'আগে যা-যা শিখিয়েছিলুম সমস্ত কিছু এই ক'মাসে দেখছি ভুলে গেছে। অ-আ ক-খ পর্যন্ত মনে নেই। এখন ওকে আবার নতুন করে বর্ণ-পরিচয়টা শেখাতে হচ্ছে। এতদিন যা-যা শিখেছিল সমস্ত ভুলে মেরে দিয়েছে। নতুন করে আবার ধারাপাত শেখাচ্ছি।'

জয়রামবাবু বললেন, 'সে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যে আবার খুঁজে পাব তারও ভরসা ছিল না। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্যেই তো সেদিন কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর পুজো দিয়ে এসেছি। তুমি আবার গোড়া থেকেই শুরু করে দাও। তারপরে ইস্কুলে একেবারে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করে দিয়ে আসব।'

বিনয় মাস্টারমশাই হিসেবে ভাল। কিন্তু জ্যোতিষ্ক নিজের মাতৃভাষাটাও ভাল করে বলতে পারে না। মাঝে-মাঝে হিন্দী ভাষা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তার।

বিনয় বলে, 'এত হিন্দী ভাষা বলে কেন বলুন তো ?'

জয়রামবাবু বলেন, 'এতদিন গুণ্ডাদের কাছে ছিল তো—তাদের দলেই বরাবর মিশে

এসেছে যে। সেই জন্যেই বোধ হয় হিন্দী শিখে এসেছিল।'

বিনয়ও স্বীকার করে। বলে, 'তাই-ই হবে হয়তো।'

জয়রামবাবু বলেন, 'ব্যাটারা যে ওকে প্রাণে মারেনি তাই-ই যথেষ্ট। যদি দুটো চোখ কানা করে দিত তাহলেই বা কী করতে পারতুম।'

সবই কপাল। জয়রামবাবু নিজের মনে-মনেই ভাবেন, হ্যাঁ, সবই মানুষের কপাল।

তা সেদিন বিনয় পড়াচ্ছে জ্যোতিকে। হঠাৎ খবর, বাইরে থেকে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি বাইরের ঘরে এলেন। এসে দেখেন তাঁরই বন্ধু সূর্যনারায়ণ। চান্দৌলির জমিদার সূর্যনারায়ণ। দেখে খুব আনন্দ হল। বললেন, 'আরে সূর্যনারায়ণ, তুমি! তুমি হঠাৎ?'

সূর্যনারায়ণ জয়রামবাবুর পুরনো বন্ধু। বহুকালের জানাশোনা তাঁর সঙ্গে। একবার জয়রামবাবু তাঁর নিমন্ত্রণে চান্দৌলিতে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন। সে আজ বহুকাল আগেকার কথা। তখন জ্যোতিষ্কর মাত্র দু'বছর বয়েস। বাপ আর ছেলে মিলে দিন-সাতেক সেখানে কাটিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য হাওয়া-বদলানো।

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কলকাতায় কী করতে এসেছ বলো!'

সূর্যনারায়ণ বললেন, 'আর বলো কেন, আমার এক প্রজার ব্যাপারে সাক্ষী হতে। তার হয়ে আমাকে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে হবে।'

'মামলা কবে?'

'কাল।'

'তাহলে আজ আমার এখানেই থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো।'

সেই ব্যবস্থাই করলেন জয়রামবাবু। সূর্যনারায়ণের জন্যে ভাল-ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করার কথা বলে দিলেন চাকর-ঠাকুরদের।

কথায় কথায় অনেক কথা উঠল। দেশের হাল-চাল। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে। গ্রামে-শহরে-গঞ্জে চুরি-ডাকাতি বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের বড় কষ্ট হচ্ছে।

জয়রামবাবু হঠাৎ বললেন, 'তুমি বোধহয় শোননি আমার ছেলে সেই জ্যোতিষ্ক একদিন চুরি হয়ে গিয়েছিল।'

'চুরি হয়ে গিয়েছিল? তার মানে? সেই তোমার ছেলে? তখন তো দেখেছিলুম তার মাত্র দু'বছর বয়েস।'

'হ্যাঁ। আমার চাকর যেমন তাকে নিয়ে রোজ পার্কে বেড়াতে যায় তেমনি একদিন বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ভাই হঠাৎ সন্ধেবেলা কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লে কি না খোকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না'

'তারপর তারপর?'

'তারপর পুলিসে খবর দিলুম। জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে কুষ্ঠি দেখালুম। যে-যা করতে বললে তাই-ই করলুম। শেষকালে তিন মাস পরে থানা থেকে পুলিস এসে খবর দিলে জ্যোতিকে পাওয়া গিয়েছে।'

'পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ ভাই, পাওয়া গেল। কিন্তু সে না-পাওয়ারই মতন। এক ব্যাটা গুন্ডা চুরি করে নিয়ে তাকে দিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করাচ্ছিল। যে চুরি করেছিল, সে ছেলে-চুরির অপরাধে আগে চার বার জেল খেটেছিল। লোকটার তো ছ'মাস জেল হয়ে গেল। কিন্তু আমার জ্যোতিকে আফিম-কোকেন খাইয়ে একেবারে প্রায় মেরে ফেলেছিল। সে সব ভুলে গিয়েছে। এখন দু' বেলা ডাক্তার আসছে আর পরীক্ষা করে যাচ্ছে। এখন আবার গোড়া থেকে অ-আ-ক-খ সব শেখাতে হচ্ছে।'

সূর্যনারায়ণ বললেন, 'যাক, ছেলের যে চোখ কানা করে দেয়নি এই রক্ষে। অনেক সময় ওরা তাই-ই করে। আমাদের চান্দৌলিতেও ভাই চৌবে বলে একজন মুদিখানার মালিক আছে, তার ছেলেটাও ভাই একদিন চূড়ামণি-যোগের সময় চুরি হয়ে গিয়েছিল। আজকাল বড্ড ছেলে-চুরি হচ্ছে।'

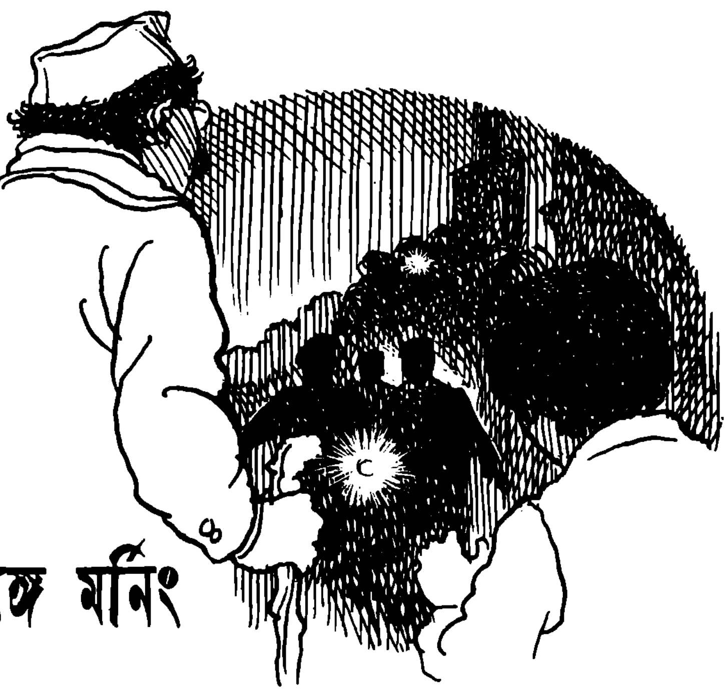
'তারপর? তারপর? তারপর কী হল?'

কথা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় ভেতর থেকে ঠাকুর এসে বললে, 'বাবু, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে—'

জয়রামবাবু বললেন, 'চলো, আগে খেয়ে নেবে চলো। খেতে খেতে কথা হবে।'

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়



দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াক

জীবন ভৌমিক

সুজয়কে ভোরবেলায় কিছুতেই ঘুম থেকে তোলা যায় না। শীতকালে তো কথাই নেই। অনেকবার ডাকাডাকি করে বিছানা থেকে সুজয়কে তুলতে বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে যায়। কাগজওলা তখন জানলার ফাঁক দিয়ে ঠকাস করে খবরের কাগজখানা ঘরে ফেলে দিয়ে যায়। কাগজ ফেলার ঐ শব্দটা শুনে সুজয় আর শুয়ে থাকতে পারে না। চশমাটা চোখে লাগিয়ে খবরের কাগজ পড়ে আধ ঘণ্টা ধরে।

মা বকাবকি করেন। বলেন, "তুমি পড়তে বসবে কখন ? এর পর মুখটুখ ধুয়ে জল-খাবার খাবে, আটটা বেজে যাবে। সকালে তোমার লেখাপড়া করবে কতক্ষণ ? সকালের পড়াটাই তো আসল! এরকম পড়াশোনা করলে কেউ লেখাপড়ায় ভাল রেজাল্ট করতে পারে না।"

ছটা নাগাদ যখন মা ঘুম থেকে ওঠেন তখনই সুজয়কে ডেকে দেন রোজ। আর রোজই সুজয় চোখ মেলে "উঠছি" বলে আবার লেপ দিয়ে মুখ চাপা দেয়। কিছুতেই যেন উঠতে ইচ্ছে করে না।

এর জন্যে বাবার কাছে, দাদুর কাছে সুজয় বিস্তর বকুনি খায়। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে সকালে যেমন লেখাপড়ার সময় নষ্ট হয়ে যায়, সন্ধেবেলাতেও তেমনি। লোড-শেডিং থাকলে তো খুব মজা। হ্যারিকেনের আলোতে পড়াশোনা করলে সুজয়ের মাথা ধরে।

আলো থাকলেও আরেক জ্বালা। ক্রিকেট খেলে এসে সন্ধেবেলায় বইখাতা নিয়ে বসতে না-বসতেই সুজয়ের হাই ওঠা শুরু হয়। ঘুম পায়।

বাবা বলেছিলেন, "দরকার নেই রাত্রে বেশিক্ষণ পড়ার। খেয়েদেয়ে ন'টার মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। ভোর পাঁচটায় উঠে পড়তে বসে যাবে।"

তা সেটাও চেষ্টা করা হয়েছে। দুচোখ ভর্তি ঘুম নিয়ে সাড়ে আটটায় সুজয় খাবার টেবিলে যায়। আর আশ্চর্য, খাবার পরই তার সব ঘুম পালিয়ে যায়। মশারির মধ্যে শুয়ে

শুয়ে সুজয় তখন গল্পের বই বা ম্যাগাজিন পড়ে। সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মায়ের সব কাজকর্ম শেষ হলে মা যখন সুজয়ের পাশে এসে শোয়, সুজয় তখন বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত তখন এগারোটার বেশি।

কিন্তু এভাবে আর কদ্দিন চলে ! সুজয় এখন বড় হয়েছে। ক্লাস সেভেনে পড়ছে। লেখাপড়ার সময় না বাড়ালে স্কুলের টাস্কই হয় না, পরীক্ষার পড়া তো দূরের কথা।

সুজয় নিজেই একদিন সমস্যার সমাধান করল। রাত্রিবেলায় সে খাবার টেবিলে বসে বলল, "আমি কাল থেকে দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াক করতে যাব।"

মা বললেন, "তা আর যাবে না! তা না গেলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর-সর্দি বাধাবে কে!"

সুজয় বলল, "কই, দাদুর তো ঠাণ্ডা লাগে না !"

মা বললেন, "দাদুর অভ্যেস হয়ে গেছে।"



সুজয় গম্ভীর হয়ে বলল, "আমারও অভ্যেস হয়ে যাবে।"

সুজয়ের দাদু মাসখানেক ধরে ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠে ফুলহাতা সোয়েটার, হনুমান-টুপি পরে বেরিয়ে পড়েন। দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যাবার জন্যে সুজয় প্রথম দিনে বায়না ধরেছিল। দাদুর পুরোপুরি সম্মতি ছিল, মায়ের একদম ছিল না, বাবা নিরপেক্ষ ছিলেন। তখন তাই সুজয়ের বায়না টেঁকেনি।

এবার সুজয় তার বাবার ভোট পেয়ে জিতে গেল। বাবা বললেন, "মর্নিং ওয়াকের লোভে যদি ঘুম থেকে ভোরে ওঠে সেটা মন্দ নয়। সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠে সব-কিছু সেরে ছটার মধ্যে পড়তে বসে যাবে। শরীরটাও ভাল থাকবে।"

সেই রাত থেকে দাদুর সঙ্গে ঘুমোবার ব্যবস্থা হল সুজয়ের। মায়ের কাছে ঘুমিয়ে অভ্যেস, তবুও দাদুর কাছে ঘুমোবারও আকর্ষণ কম নয়। পুরনো দিনের কত কথা দাদুর কাছে শুয়ে শুয়ে শোনা যাবে। যতক্ষণ ইচ্ছে গল্পের বই পড়া যাবে। কারণ দাদু নিজেও বই পড়েন। আসল অসুবিধেটা হবে সুজয়ের মায়ের। কারণ সুজয়কে ছাড়া তার মায়ের ঘুম আসতে চায় না সহজে। সবই অবশ্য অভ্যেসের ব্যাপার।

দাদুর ঘরে সুজয়ের লেপ বালিশ ঠিক-ঠাক করে দিলেন মা। ভোরবেলায় কটা জামা, সোয়েটার, কোন মাফলার পরবে, সব তার মা দাদুর ঘরে গুছিয়ে রেখে এলেন। জুতো-মোজা খাটের নীচে রাখা হল। আর দাদু তাঁর ছোলা ভেজানো বাটিতে আরও এক মুঠো ছোলা দিয়ে দিলেন। সুজয়কে মর্নিং ওয়াকের সঙ্গী পেয়ে দাদুর মনে খুব আনন্দ।

সুজয়ের দাদুর ঘুম রোজই ঠিক চারটের পর ভেঙে যায়। ঘরে সারারাত নাইট ল্যাম্প জ্বলে। ঘুম ভাঙলেই সুজয়ের দাদু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন চারটে পাঁচ বা দশ। তারপর সুজয়কে ডেকে তোলেন। ঠিকঠাক হয়ে দুজনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়েন। ওদের মর্নিং ওয়াকের জন্যে বাড়ির অন্য কারও যাতে ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্যে ওরা জোরে কথা বলে না, কোনও শব্দ করে না। দরজা খোলার একটুও শব্দ হয় না।

ওরা জি টি রোড ধরে বালি ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে। সুজয়ের খুব ভাল লাগে। ডিসেম্বরের ভোর যে এমন স্নিগ্ধ তা সুজয়ের জানা ছিল না। অন্ধকারের কলসি ভেঙে ফিকে আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। আর কী সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ। রাস্তার ধারের গাছগুলোর মাথায় পাখি ডাকছে, কাক ডাকছে। আর কোনও শব্দ নেই। ফেরার পথে আস্তে আস্তে শব্দগুলো জেগে ওঠে। তাও যেন খুব সাবধানে।

দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াক করতে করতে সুজয়ের খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। সকালবেলায় লেখাপড়াতেও বেশ মন বসছে। মা-বাবা খুব খুশি।

একদিন এক কাণ্ড হল। রোজকার মতই অন্ধকার থাকতে দাদুর সঙ্গে বেরিয়ে সুজয় দাদুর সঙ্গে জি টি রোড ধরে হাঁটছে। কিছুটা যাবার পর সুজয় দেখল বন্দুক কাঁধে চারজন পুলিস আসছে সামনে থেকে। এর আগে রাস্তায় এই সময় পুলিস দেখা যায়নি। পুলিসও মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে কিনা এরকম একটা প্রশ্ন সুজয়ের মনে উঁকি দিচ্ছিল। আবার এটাও সত্যি যে নির্জন রাস্তায় পুলিস দেখে সুজয় একটু ভয় পেয়েছিল। সুজয় দাদুর ডান হাতখানা নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিল। আর ঠিক তখনই পুলিসগুলো সামনে এসে ওদের ঘিরে ধরল।

একজন পুলিস জিজ্ঞেস করল, "কে তোমরা?"

দাদু বললেন, "কে মানে? আমরা মানুষ।।"

পুলিস বলল, "চালাকি করবে না। ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?"

সুজয় ভয়ে কোনও কথা বলতে পারছিল না। দাদু বললেন, "আমি কি ছেলেধরা? এ আমার নাতি, সুজয়।"

চারজন পুলিস এক সঙ্গে ধমকে উঠল। "চোপ। ধরা পড়লে সব ছেলেধরাই দাদু বনে যায়।"

দাদু বললেন, "দেখুন সিপাইজি, আপনাদের ব্যবহারে আমি খুব অসন্তুষ্ট। আমি আপনাদের নামে থানায় রিপোর্ট করব। আমরা মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছি আর আপনারা আমাদের হয়রান করছেন।"

"মর্নিং ওয়াক?" চারজন পুলিসের আটখানা চোখ কপালে উঠল। ওদের মুখে রা নেই।

দাদু বললেন, "কেন, মর্নিং ওয়াক করার অধিকার কী আমাদের নেই? আমরা তো রোজই মর্নিং ওয়াক করি।"

একজন পুলিস তার কব্জিটা তুলে টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়িটা দেখল। বলল, "রাত পৌনে তিনটের সময় মর্নিং ওয়াক!"

সুজয় এবার মুখ খুলল। দাদুকে হেনস্থা হতে দেখে সে বলল, "আপনার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নিজে আমাদের বড় ঘড়িতে চারটে দশ বেজে গেছে দেখে দাদুকে ডেকেছি। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।"

পুলিস সুজয়ের কথায় কান না দিয়ে তাদের দুজনকে নিয়ে থানায় গেল। থানার বড়বাবুর আদেশে একজন দারোগা সুজয় আর তার দাদুকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুজয়ের মা-বাবাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাঁদের দিয়ে সুজয় ও তার দাদুকে শনাক্ত করিয়ে ছেড়ে দিল।

সুজয়ের মা সুজয়ের দাদুকে বললেন, "বাবা, সুজয় না-হয় ঘুমচোখে রাত দুটো কুড়িকে চারটে দশ মনে করেছে, তা বলে আপনি রাত দুপুরে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে পড়বেন!"

বলতে বলতে সুজয়ের মা হেসে ফেললেন। সুজয়ের বাবাও হাসলেন। বললেন, "সত্যি, দাদু আর নাতিতে মিলে যা একখানা কান্ড দেখালে না।"

দাদু বললেন, "আমি যে ঘড়ির দিকে তাকাইনি তা নয়। তবে সুজয় যখন বললে, দাদু চারটে দশ হয়ে গেছে তখন আমিও চোখ মেলে যেন তাই দেখলাম। আসলে ঘড়ির ছোট কাঁটা আর বড় কাঁটা গুলিয়ে গিয়েছিল।"

সুজয় বলল, "তা থাক, একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হল।"

মা বললেন, "এরকম অ্যাডভেঞ্চারের দরকার নেই। কাল থেকে দুজনেরই মর্নিং ওয়াক বন্ধ।"



শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭			
	■	■		■	■	
■	৮					■
৯	■	■		■	■	১০
১১	১২	১৩		■	১৪	
১৫			■	১৬		

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) না থাকলে ঘর অন্ধকূপ। (৩) পাখিবিশেষ। (৬) সমষ্টিবাচক শব্দ। (৭) যে-গ্রহের দুটি উপগ্রহ। (৮) আংটি নয়, তবু প্রয়োজনে কেউ-কেউ আঙুলে পরে। (৯) বিখ্যাত এক কবি। (১৪) পাখির আস্তানা। (১৫) বধ্যভূমি। (১৬) একটি তীর্থস্থান।

উপর-নীচ ঃ (১) কাঠ-বিশেষ। (২) জাদু। (৩) অভিসম্পাত। (৪) কোন্ ফলের চীনে নাম? (৫) দুমুখো শব্দে কোন্ মূল্যবান ধাতু? (৭) আমাদের সমুদ্রগুপ্তকে ইউরোপের যে-সম্রাটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। (৯) অসভ্য জাতিদের আরাধ্য। (১০) রামায়ণোক্ত রাক্ষসী। (১২) রাত্রি। (১৩) বৎসর। (১৪) জল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

নে	রু	দা	■	ন	ন্দি	নী
ক	■	বা	তু	ল	■	বা
ড়ে	■	■	তি	■	■	র
■	কা	রা	কো	রা	ম	■
তা	ল	■	রি	■	রী	তি
■	নে	■	ন	■	চি	■
তা	মি	ল	■	শ	কা	রি

ধাঁধা

"গৌরী আবার একটা ধাঁধা পাঠিয়েছে।" ছোটকা বলল।

"ওর কলেজের বন্ধুদের নিয়ে?" আমি তক্ষুনি পাল্টা প্রশ্ন করলাম। কেননা, গৌরী এর আগে যতবার ধাঁধা পাঠিয়েছে, সবই ওর বন্ধুদের নিয়ে। ধাঁধাগুলো অবশ্য খুবই ভাল।

ছোটকা বলল, "না। কলেজের বন্ধুদের নিয়ে নয়। তবে কলেজ যাবার পথেই দেখা ব্যাপারটা। বেশ ইন্টারেস্টিং ধাঁধা। আমরাও



এমন একটা ঘটনা কখনো না কখনো দেখেছি বাসে-ট্রামে, কিন্তু এর মধ্যে যে এমন মজার একটা ধাঁধা রয়েছে, খেয়াল করিনি। গৌরীটার বুদ্ধি আছে।"

আমি ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। কী এমন ধাঁধা হতে পারে যা অনেকেই দেখেছে বাসে-ট্রামে। অথচ গৌরীই খেয়াল করেছে, বুঝতে পারছিলাম না। তাই ব্যস্ত হয়ে তক্ষুনি কাগজকলম খুলে লিখতে শুরু করলাম। ছোটকা ব্যস্ততা দেখে একটু হেসে ধাঁধা বলতে লাগল।

প্রথম ধাঁধা ॥ বাসে পাশাপাশি সিটে দুজন লোক বসে রয়েছে। কেউ কারো চেনা নয়, কনডাকটরও চেনে না দুজনের কাউকেই।

কনডাকটার এসে ভাড়া চাইল।

দুজনেই কনডাকটরকে পঁচিশ পয়সা করে দিল। একজনের বেলা কনডাকটর কোনো প্রশ্ন না করেই টিকিট দিয়ে দিল। লোকটিও নিজের থেকে কিছু বলেনি কনডাকটরকে। অন্য জনের বেলা কনডাকটর কিন্তু পয়সা পেয়েই টিকিট দিল না। জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়?" লোকটি কী একটা উত্তর দিল, কনডাকটার তারপর টিকিট ছিঁড়ে দিল লোকটার হাতে।

কেন এমন করল কনডাকটর অনুমান করতে পার?

না, বাসটার কোনো বিশেষত্ব নেই, অর্ডিনারি বাস। এল মার্কা বা ডিলাক্স বা স্পেশাল নয়।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নাতিকে কোলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন। নাতির বয়স কত, জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোক হেঁয়ালি করে উত্তর দিলেন। বললেন, তাঁর বয়স আর তাঁর নাতির বয়স গুণ করলে যা হয়, সেই গুণফলের মধ্যেই দু-জনের বয়সের সব-কটি অঙ্ক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কার কত বয়স বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৬	৪	৩	৭	৫
৩	২	?	১	৪
৯	৬	৭	৮	৯

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৫৫ (৬৬) ৭৩

৯৩ (?) ১৭

গতবারের উত্তর ॥ (১) সওয়া বারোটা থেকে পৌনে দুটোর মধ্যে ঘড়িতে সাত বার ১টা করে আওয়াজ হবে। (২) চার ঘণ্টা। (৩) ৬। (৪) ৩৭ (অন্য সংখ্যাগুলি ৭ দিয়ে বিভাজ্য)।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল
কল থেকে জল-পড়ার ছবি
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ ভাল ছেলে হতে হলে কী করতে হয়?

উঃ পাতে মাছভাজা পড়লে সেটা না উল্টে খেয়ে নিতে হয়।

প্রঃ মার শ্রাদ্ধে আমাকে তো মাথা ন্যাড়া করতে হল। এদিকে বাড়ি থেকে বেরুতে হলেই একটা বেল গাছ। কী করি বলুন তো?

উঃ একটা নোটবই আর পেনসিল রাখবেন পকেটে, কতবার বেল-তলা দিয়ে যাতায়াত করছেন সেটা টুকে রাখবেন।

প্রঃ আমাকে বিদেশমন্ত্রীর পদ দিলে আমি কিছুতেই রাজি হব না, কেন জানো?

উঃ প্লেনে চড়লেই আমার ভীষণ মাথা ঘোরে।

সুসেন

মজার খেলা

এই খেলাটার জন্য আগে থেকে একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। একটা ঝুড়িতে বা ট্রেতে কিছু বিচিত্র ধরনের জিনিস সাজিয়ে রাখতে হবে। যেমন ধরো, একটা খেলনা পিস্তল, ভাঙা চশমা, পেন, স্লেলের টাইমটেবল, টুথব্রাশ, কাঁচি, ছুঁচ-সুতো, একপাটি জুতো, তুলো, চাবি, মানিব্যাগ, রুমাল, ছুরি, টর্চ পুতুল—এমন নানা ধরনের জিনিস।

এমনভাবে রাখতে হবে জিনিসগুলো যাতে এক নজরে বেশ ঠাহর হয়। এবার খেলাটা খেলতে হবে কীভাবে সেটা শিখে নাও।

বন্ধুদের মধ্যে কাউকে বলো, ঝুড়িতে বা ট্রেতে রাখা এই জিনিসগুলো থেকে সে যে-কোনো



চারটে জিনিস পছন্দ করে নিক প্রথমে। এরপর মিনিট পাঁচেক ধরে সে একটা গল্প বলবে। গল্পটা নিজেই বানাবে সে। তবে একটা শর্ত, গল্পের মধ্যে কোথাও না কোথাও তার পছন্দ-করা জিনিস চারটের উল্লেখ করতে হবে। না হলে সে আউট।

এইভাবে অনেক বন্ধুকেই একের পর এক ডেকে গল্প বলতে বলা যায়। কার গল্প সব থেকে সুন্দর হল সেটা ঠিক করবে অন্য সকলে যারা খেলছে না। শুধু গল্প শুনে মতামত দেওয়াটাই যাদের কাজ, অর্থাৎ বাবা-মা ও অন্যান্য বড়রা।

হ্যাঁ, বড়রাও থাকবেন বই কী। কেননা, এসব খেলা তো খেলতে হবে জন্মদিনের পার্টিতে বা অন্য কোনো উৎসবের দিনে, যেখানে ছোট-বড় সকলে জড়ো হয়ে একসঙ্গে হইহই করতে চাইবে।

মজারু

হাসিখুশি



একজন লোক একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পেট পুরে খেয়ে ক্যাশিয়ারকে বলল, "দেখুন আমার কাছে একটি পয়সাও নেই, অতএব দাম দিতে পারছি না।"

ক্যাশিয়ার বললেন, "ঠিক আছে তাতে আর কী হয়েছে। আপনার নাম ঐ দেওয়ালের পেরেকের নীচে পেনসিল দিয়ে লিখে রাখুন, তারপর যেদিন এদিকে আসবেন দামটা দিয়ে যাবেন।"

লোকটি বলল, "কিন্তু দেওয়ালে আমার নামটা সকলে দেখতে পাবে তো।"

ক্যাশিয়ার বললেন, "না, সে ভয় নেই, আপনার জামাটা পেরেক থেকে ঝুলিয়ে দেব, নাম দেখে কার সাধ্য।"



মন্টু তার নতুন বন্ধু ডাব্বুকে বলল, "জানিস, আমার মামা গান লেখেন, তাঁর লেখা অনেক গান রেকর্ড হয়েছে।"

ডাব্বু বলল, "আমার মামাও তো লেখেন রে, তবে আধুনিক-ফাধুনিক নয়—রবীন্দ্রসঙ্গীত। শুধু লেখেনই না, নিজে সুরও দেন।"

ছবি দেবাশিস দেব



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৪ ॥

চৌষট্টির ফুটবল-মরসুমে লীগ ও শীল্ড খেলার মাঝে আমরা কুয়ালালামপুর গিয়েছিলুম মারডেকা ফুটবলে খেলতে। তার অনেক আগে, মার্চ মাসে দিল্লির একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ওখানে দিল্লির সঙ্গে বাংলার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে আমি ভাল কিছু করেছিলুম বলে ঘটনাটির কথা লিখছি না। বরং বলব, ব্যাট করতে বেশ অসুবিধাই বোধ করছিলুম রাজিন্দার গোয়েলের বলে।

গোয়েল ছিল আমাদের স্টেট ব্যাঙ্কেরই খেলোয়াড়। আমার সঙ্গে ভাবও ছিল খুব। নিখুঁত লেংথে বাঁ-হাতে ভাল স্পিন করত। সিংহলের বিরুদ্ধে ভারত-দলে আন-অফিসিয়াল টেস্ট খেলেছে। রাজিন্দার গোয়েল মাঝে মাঝে তার স্পিনে আমাকে ঠকিয়ে দিচ্ছিল আর মজা উপভোগ করছিল। এমন সময় জলপানের বিরতি হল। আমি সাময়িকভাবে স্বস্তি পেলুম। হাতের গ্লাভস খুলে সব খেলোয়াড় এক জায়গায় জড়ো হয়ে হাতে-মুখে জল দিচ্ছে, হঠাৎ দেখি চেনা এক সাংবাদিক মাঠে ঢুকে হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বললেন, "চুনী, একটা সুসংবাদ তোমাকে দিতে পারি। এইমাত্র খবর পেলুম, সরকার তোমাকে এবার অর্জুন পুরস্কার দিচ্ছেন।" স্বভাবতই সংবাদ শুনে আমি খুব খুশি হলুম। সবাই অভিনন্দন জানাল। আমার পাশেই ছিল রাজিন্দার গোয়েল। বলল, "চুনী, অর্জুন অ্যাওয়ার্ড? নিশ্চয়ই তোমার আজকের ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিংয়ের জন্য নয়।" ওর রসিকতায় সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

ওই সময় রঞ্জি ও দলীপ ট্রফির খেলায় আমার স্থান একরকম পাকা হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা কিছু ক্রিকেট বোঝেন, তাঁরা বলাবলি করতে আরম্ভ করলেন : আর একটু আগে ক্রিকেটে এই আগ্রহ দেখালে চুনী নির্ঘাত টেস্ট ম্যাচ খেলার ডাক পেত।

তাঁরা যাই বলুন না কেন, আমি তো আমার ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলুম। তবে সিরিয়াসলি ক্রিকেট শুরু করতে একটু দেরি করে ফেললেও ক্রিকেটের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ ও রস পেতুম। খেলতে খুবই ভাল লাগত। ফুটবল খেলতে-খেলতে কেমন যেন একটা ক্লান্তি এসে যাচ্ছিল। তার ওপর প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ইরানের কাছে দুবার হেরে যাওয়ায় হতাশাও দানা বাঁধছিল মনে। এমন সময় পেলুম মারডেকায় খেলার ডাক। আমাকেই আবার ভারত-দলের অধিনায়ক করা হল।

আমাদের ভারত এখন আর মারডেকা ফুটবলের ওপর তেমন কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। কয়েকবার তো খেলতেই যায়নি। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা-প্রাপ্তি উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই মারডেকা ফুটবল শুরু হয় সাতান্ন সালে। মারডেকা শব্দের অর্থই স্বাধীনতা-উৎসব। এটি এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতা। আগে 'ফিফা'র প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যানলি রউসকে এই প্রতিযোগিতার সময় আমন্ত্রণ জানানো হত। ভারতও প্রতিযোগিতায় যোগ দিত যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে। তার কারণ মালয়েশিয়ার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ভাল। মালয়েশিয়ার তখনকার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আব্দুল রহমান ছিলেন ফুটবলে দারুণ উৎসাহী। ট্রফিটি তাঁরই নামে। তিনি সরাসরি ভারত সরকারের কাছে আমন্ত্রণ পাঠাতেন, যাতে ভারতীয় দল খেলতে যায়।

চৌষট্টির প্রতিযোগিতার মুখে আমি ভাবলুম ইরানের কাছে হারের ফলে এশীয় ফুটবলে ভারতের সুনাম নষ্ট হয়েছে। কুয়ালালামপুর থেকে টুংকু ট্রফিটি জিতে আনতে পারলে সেই সম্মান পুনরুদ্ধার হতে পারে। তারপর আমি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা থেকে বিদায় নেব।

কিন্তু কুয়ালালামপুর যাত্রার আগে আমাদের গোটা দলের প্রতি ফুটবল ফেডারেশনের অবহেলা আমার মনকে বিষিয়ে তুলল। ব্যবস্থা ছিল সব খেলোয়াড় বোম্বাইয়ে সমবেত হবে। ওখানে কয়েকদিন প্র্যাকটিস

করে কুয়ালালামপুর যাবে। বোম্বাইয়ে আমাদের তোলা হল ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে ঘিঞ্জি নোংরা পরিবেশের এক আস্তানায়। সেটা ঠিক হোটেলও নয়, এক কথায় বলা যায় —মুসাফিরখানা। এই ব্যবস্থায় দলের প্রত্যেকেই অখুশি। আমি ভাবলুম, এই কি ফুটবলারদের ভাগ্য! ইরানের কাছে হেরেছি বলেই কি এত অবহেলা! রঞ্জি লেবেলের ক্রিকেটার হয়েও কত ভাল হোটেলে থেকেছি। কত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি। মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়ে থেকেছি রাজার হালে। আর জাতীয় দলের ফুটবলারদের প্রতি এত তাচ্ছিল্য। দলের অধিনায়ক হিসাবে ওই তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদ জানাবার আমার আর কী উপায়ই বা ছিল অসময়ে ফুটবল থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া! ভেবেছিলুম, তাতে ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিদের চোখ খুলতে পারে।

প্রশিক্ষণের জন্য ফেডারেশন আর একজন নতুন কোচ নিয়োগ করেছিলেন। বোম্বাইয়ের আমেদ হোসেন। যিনি পরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেরও কোচ হয়েছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠে সবাই প্র্যাকটিস করছিল। ব্যাজার হয়ে আমি বসেছিলুম মাঠের পাশে। বোম্বাইয়ের বেশ কিছু সাংবাদিক এসেছিলেন জাতীয় দলের প্র্যাকটিস দেখতে। আমি বসে আছি দেখে কয়েকজন কটাক্ষ করে বললেন,—"ক্যাপ্টেনের আর প্র্যাকটিসের দরকার কী, দলে তো স্থান বাঁধা।"

একজন কাছে এসে বললেন, "চুনী, খেলছ না কেন?"

থাকা-খাওয়ার বিশ্রী বন্দোবস্তে মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। মনে দুঃখ এবং আবেগও ছিল। বললুম, "চুনী গোস্বামী আর কোনোদিনই কুপারেজে খেলবে না। আমি ভাবছি ফুটবল থেকে বিদায় নেব। বিশেষ করে এর পরে ভারত-দলের হয়ে আর বিদেশে খেলতে যাব না।"

পরের দিন সকালেই দেখি সব খবরের কাগজে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বড় বড় হেডিং: চুনী গোস্বামী, ক্যাপ্টেন অব দ্য ইন্ডিয়ান টিম, রিটায়ারিং ফ্রম ফুটবল।

ভাবলুম আবেগের বশে রিটায়ার করার কথা একটু আগেই বলে ফেলেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, শেষ-বিদেশ সফরে



মারডেকা প্রতিযোগিতায় ভারত বনাম জাপানের খেলা

যেন মুখ রাখতে পারি। যেন পারি ভারতীয় ফুটবলের হারানো ইজ্জত পুনরুদ্ধার করতে।

পুরোপুরি না পারলেও কিছুটা পেরেছিলুম নিশ্চয়ই। আমরা অল্পের জন্য মারডেকা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি, কিন্তু রানার্স হয়েছিলুম। ওই একবারই। আগে বা পরে আর কোনোবারই ভারত মারডেকার ফাইনালে উঠতে পারেনি।

আমার অধিনায়কত্বে ভারত পেয়েছে জাকর্তা এশিয়ান গেমসে সোনার পদক, ইজরায়েলে এশিয়ান কাপের খেলায় রুপোর পদক এবং মারডেকায় রানার্সের সম্মান।

মারডেকায় সে-বছর আমরা সত্যিই খুব ভাল খেলেছিলুম। সাতাশে আগস্ট গ্রুপের প্রথম খেলায় হেলাফেলা করে কাম্বোডিয়াকে হারালুম ৪—০ গোলে। আমি প্রথম গোল করার পর ডেরিক ডি'সুজা দুটি ও ইন্দার সিং করল একটি গোল। ২৯ তারিখে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতলুম ২—১ গোলে। গোল করেছিলুম আমি ও অসীম মৌলিক। পয়লা সেপ্টেম্বর হাড্ডাহাড্ডি খেলায় জাপানকে ৩—২ গোলে হারিয়ে আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলুম। জয় আমার, ডি সুজার ও কাজল মুখার্জির গোলে।

আমাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলা একদিন মিনিট পনেরো হয়ে বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিন চার সেপ্টেম্বর তারিখে ওঠা-পড়ার নাটকীয় আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে আমরা ফাইনালে উঠলুম। কোরীয় দল পর পর তিনটি প্রতিযোগিতায় হারল আমাদের কাছে। জাকর্তায়, ইজরায়েলে এবং কুয়ালালামপুরে। ওখানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে পি-কে এবং ইন্দার সিং।

অপরদিক থেকে ফাইনালে উঠেছিল বর্মা। আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন রিপাবলিক অব চায়নার কাছে গ্রুপের খেলায় বর্মা যেভাবে ৪—২ গোলে হেরে গিয়েছিল, এবং যেভাবে ১—০ গোলে জিতেছিল ভিয়েত নামের বিরুদ্ধে, তাতে আমরা ধরে নিয়েছিলুম যে, আমাদের শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ওদের হারিয়ে টুংকু ট্রফি পাবই।

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)



মারডেকা প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়ার রাজার কাছ থেকে রানার্স আপ ট্রফি নিচ্ছেন চুনী গোস্বামী

কিন্তু ফাইনালে সত্যিই অনেক ভাল খেলেও আমরা বর্মার কাছে হেরে গেলুম ০—১ গোলে। একেবারেই অপ্রত্যাশিত হার আচমকা গোলে। আমাদের মাঠজোড়া আধিপত্য সত্ত্বেও পঁয়ষট্টি মিনিট পর্যন্ত ম্যাচ ছিল গোল-শূন্য। ওই সময়ে দু'তিনজনের বাধা কাটিয়ে আমি ঢুকেছি পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে। আমাকে এমনভাবে অবৈধ ট্যাকল করা হল যে, মাঠে লুটিয়ে পড়লুম। বুটের আঘাতে উরুর পেছনে গভীর ক্ষত হয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। পেনাল্টি-বক্স লাইনের প্রায় উপর থেকে আমরা পেলুম ফ্রি-কিক। আমাকে তখন স্ট্রেচারে শুইয়ে মাঠের পাশ দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার চোখ রয়েছে মাঠের দিকে। স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়েই দেখলুম প্রশান্ত সিংহ দুর্দান্ত ফ্রি-কিক করল। বর্মার গোলকীপারের বল আটকানোর কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু প্রশান্তর রকেটের মতো ওই শট গোলপোস্ট ও ক্রস-বারের কোণায় লেগে ফিরে এল। ওই ফিরতি বল থেকে আমাদের হতচকিত ডিফেন্সের মধ্য দিয়ে আক্রমণ তৈরি করে বর্মা করল জয়সূচক গোল। প্রথম হল মারডেকা ফুটবল চাম্পিয়ন। সেই থেকে এশীয় ফুটবলে বর্মার সুনাম।

মারডেকা ফুটবল খেলতে খেলতে শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অনেকগুলি চিঠি পেয়েছিলুম। দু'একটি টেলিগ্রামও। সংবাদপত্রে আমার রিটায়ার করার সিদ্ধান্ত জেনে অনেকেই হয়ত ব্যথা পেয়েছিলেন। প্রত্যেকেই অনুরোধ করেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি যেন ফুটবল থেকে বিদায় না নিই। সিদ্ধান্ত কি বদল করা যায় না? উত্তরে তাঁদের জানিয়েছিলাম : না, আমি ক্লাবের খেলা থেকে অবসর নেব না। তবে ভারত দলের হয়ে বিদেশে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলব না। এশীয় ফুটবলে ভারতের নষ্ট সুনাম যে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, এটাই সান্ত্বনা হয়ে থাক।

আমি আগেই ভেবে রেখেছিলুম, ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের ব্যাপারে আমি অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের নীতি গ্রহণ করব। ও'রা অনেক আগে রিটায়ার করেন। "ও কেন রিটায়ার করছে না?" —এই কথা শোনার আগেই সবাই শুনতে চায়—"ও কেন এখন রিটায়ার করেছে?"

আগেই লিখেছি, বোম্বাইয়ে সাংবাদিক-দের কাছে রিটায়ার করার কথা বলেছিলুম দুঃখ ও আবেগের বশে। পরে ক্লাবের হয়ে আমি লীগ, শীল্ড খেলেছি। খেলেছি ডুরান্ড কাপেও। পঁয়ষট্টি সালেই আবার কিছুটা বাধ্য হয়ে আমাকে ভারত দলের অধিনায়ক হতে হয়েছিল সফরকারী রাশিয়ান ফুটবল দলের বিরুদ্ধে। তবে খেলাগুলি হয়েছিল দেশের মাঠে এবং প্রদর্শনী ম্যাচ হিসাবে। বিদেশের মাঠে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলিনি। খেলিনি কুপারেজ মাঠেও। না, ক্লাবের হয়ে রোভার্স কাপেও না।

মারডেকা ফুটবলে দুটি মজার ঘটনা ঘটেছে। লিখব পরের সংখ্যায়। (ক্রমশ)

নামের মাহাত্ম্য

রাধারমণ গোস্বামী

গোষ্ঠজীবন মুস্তফী সে
মস্ত বড় কারবারি
ফাটকা-জুয়ায় আটকে প'ড়ে
হয়ে গেল জেরবারই।
উঠল লাটে ব্যবসাগুলো
ধরল কাঁপন মন-দেহে,
দেখছে আঁধার দুচোখ ভরে
ভুগছে বিষম সন্দেহে :
দৈব সহায় না হলে আর
হবেই না তার উন্নতি,
তুলবে টেনে সেই ম্যানেজার
থাকে তাহার গুণ যদি।
ধর্মনিষ্ঠ, ভাবাবিষ্ট,
চেয়ে শুধু তেমন জন
কাগজগুলোয় ফলাও করে
ছাপল শেষে বিজ্ঞাপন।
হপ্তা ধরে আবেদনের
পত্র এল সাত কাঁড়ি,
গোমস্তারা লিস্টি করে
রাত্রি জেগে হাত নাড়ি।
ভুবন দলুই, গগন বেরা
শম্ভু বিশী, ভূষণ পাল,
সত্যজীবন কারফর্মা,
চিত্ত বসাক, শ্যাম ঘোষাল,
নেত্য গড়াই, বদন রানা,
রামকিঙ্কর মজুমদার,
গৌর মাইতি, নন্দ মৃধা,
কৃষ্ণমোহন দে সরকার ;
অনেক খুঁজে বেছে শেষে
চোখ পড়েছে সুপাত্রে,
ম্যানেজারের চাকরি পেল
আদ্যাশক্তিপ্রসাদ দে।


আমরা সত্যিই এসে গেছি
তোমরা সবাই তৈরী তো ?
জেমিনী সার্কাস
DARING DEATH DEFYING MOTOR BIKE AND JEEP JUMP!
MOTOR CYCLE SKY-RIDER
DOGS' FOOTBALL
পার্ক সার্কাস ময়দানে



বন্ধু

(পাঞ্জাবের উপকথা)

আরতি দাস

এক শেয়ালের কোনো বন্ধু নেই। একদিন একা একা জঙ্গলে ঘুরছে, এমন সময় এক ময়ূরকে দেখে একেবারে থ হয়ে গেল সে। কী সুন্দর রঙবেরঙের পেখম। তেমনি চমৎকার নাচে ময়ূর। দেখেই শেয়ালের মাথায় টনক নড়ে উঠল। ভাবল, যে করেই হোক, এই ময়ূরের সঙ্গে ভাব করতে হবে। এমন সুন্দর পাখির পাশে পাশে হাঁটতে পারলে, যে-কেউ বর্তে যাবে। সেদিন থেকেই বন্ধু হবার আশায় ময়ূরের পেছনে ঘুরঘুর করতে লাগল শেয়াল।

ময়ূর কিন্তু শেয়ালের দিকে ফিরেও তাকায় না। সে নিজে সুন্দর বলে মনে মনে তার দারুণ অহঙ্কার। বনের মধ্যে পোকামাকড় পেলেই খায়, আর আকাশে মেঘ দেখলে পেখম তুলে নাচে। রোজ সকাল হলে ময়ূর চিৎকার করে, পি-হুউ পি-হুউ বলে ডাকে।

বিশ্রী আওয়াজটা ভাল লাগে না শেয়ালের। তাই একদিন খুব সাহস করে ময়ূরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "ভাইসাব্, এমন সুন্দর চেহারা তোমার, অথচ তোমার ডাক শুনলে মনে হয় যেন ভীষণ কষ্ট পেয়ে চেঁচাচ্ছ। তুমি কোকিলের মতো মিষ্টি গলায় কু-উ কু-উ ডাকতে পারো না?"

"তা কি আর পারিনে?" ময়ূর ঘাড় বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "আমিও কোকিলের মতো মিষ্টি সুরে ডাকতে পারি। কিন্তু কে আর আমায় শেখাচ্ছে, বল!"

"এ আর এমন শক্ত কী," শেয়াল তাড়াতাড়ি বলল, "আমিই তোমায় কোকিলের ডাক শিখিয়ে দেব।" এ কথায় দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল।

ময়ূরের সঙ্গে ভাব হতেই শেয়াল নাওয়া-খাওয়া ভুলে বন্ধুর কথায় ওঠবোস করতে লাগল। সকালে ঘুম ভেঙে গেলেই খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়া বরাবরের অভ্যেস। কী খাবে, কোত্থেকে একটা হাঁস কি মুরগি ধরে আনবে, কোন্ গেরস্তবাড়ি থেকে কী চুরি করে খাওয়া যায়—এইসব ধান্দায় দিন কাটত শেয়ালের। কিন্তু এখন সে সময় কোথায়? ময়ূর-বন্ধুকে ফেলে একদণ্ডের জন্যও কোথাও যেতে মন চায় না। সারাদিন একসঙ্গে

ঘোরাঘুরি আর সারাক্ষণ শেয়ালের মাথায় এক চিন্তা, কী করলে ময়ূরের মতো ভাবভঙ্গি হাঁটাচলা রপ্ত হবে ওর।

সুযোগ পেলেই বন্ধুর নকল করে হাঁটে। মনে মনে খুবই ইচ্ছে, অবিকল ময়ূরের মতো লেজ তুলে নাচতে। কিন্তু পাছে কেউ দেখে হেসে ওঠে, এই ভয়ে আর লজ্জায় লেজ গুটিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটে।

একদিন দুপুরবেলা শেয়ালের ঘরে খাবার-দাবার কিছু নেই। আগের দিন কোত্থেকে একটা কচি পাঁঠার ঠ্যাং জুটেছিল ভাগ্যে, তা সেটাকে চেটেপুটে খেয়ে, হাড়ের টুকরোগুলো ফেলে রেখেছে গর্তে। ওদিকে জঙ্গলের গাছতলা থেকে একরাশ পাকা কুল কুড়িয়ে এনে খেতে বসেছে ময়ূর।

খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে শেয়ালের। কুল কখনো খায়নি, তবু ভাবছে, দুটো কুল চেয়ে নেবে কি না। শেষটায় মরিয়ার মতো মুখ ফুটে চাইতেই ময়ূর তড়বড়িয়ে বলে উঠল, "আহ্-হা-হা, তা আগে বলতে হয়! আর একটাও কুল নেই যে তোমায় খেতে দিই।" এই বলে, ময়ূর ঠোঁটে করে কুলের আঁটিগুলো কুড়িয়ে এনে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিল পাশাপাশি।

তা দেখে শেয়াল অবাক। শুধোল, "ভাইসাব, তুমি আঁটিগুলো জমিতে পুঁতে দিচ্ছ যে?" ময়ূর পেখমের ধুলো ঝেড়ে সাফসুতরো হচ্ছিল। শেয়ালের কথায় জাঁক করে বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব ভাল সহবত পেয়েছি তো! এ-সব আমার মার শেখানো। মা বলেন, কোনো জিনিস নষ্ট করতে নেই। এই যে বিচি বুনে দিলুম, এ থেকে কুলগাছ হবে। তারপর গাছ ভর্তি করে কুল হবে। কুল পাকলে ময়ূরগোষ্ঠীর সব আত্মীয়কুটুম ডেকে পাকা কুলের ভোজ খাওয়াব। বুঝলে তো?"

ময়ূরের তুখোড় বুদ্ধি দেখে শেয়াল তাজ্জব বনে গেল। ঠিক তো! এই সাদা কথাটা আমার মাথায় আসেনি। আমিও যদি গর্তের ভিতর থেকে হাড়ের টুকরোগুলো এনে পুঁতে দিই তাহলে নিশ্চয় প্রত্যেক টুকরো থেকে এক-একটা কচি পাঁঠা জন্মাবে।

যে কথা সেই কাজ। শেয়াল হাড়ের টুকরোগুলো এনে, জমিতে গর্ত খুঁড়ে সার করে পুঁতে দিল। সারাদিন দুই বন্ধু একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সূর্য ডোবার সময় যে যার জমিতে এসে দেখে, কদ্দুর কী হল!

একদিন দেখা গেল ময়ূরের জমিতে কুলবিচি ফুঁড়ে সবুজ অঙ্কুর বেরিয়েছে। এদিকে শেয়ালের খেতে কচি পাঁঠা গজাবার কোনো লক্ষণ নেই। ব্যাপার দেখে শেয়াল মনে মনে ভারী দমে গেল। কিন্তু তা বলে ময়ূরের কাছে হার মানবে কেন? বারবার বলতে লাগল, "ছাগলদের বেড়ে উঠতে খুব দেরি হয়, বুঝলে হে, আমি তো দেখেছি এক-একটা ছাগল বড় হতে পাঁচ-দশ বছর সময় লেগে যায়।"

"তাই নাকি?" ময়ূর খুব একচোট হেসে নিল। তারপর বলল, "আরে বন্ধু, সাতজন্ম পুঁতে রাখলেও হাড়ের টুকরো থেকে ছাগল গজাতে দেখিনি কখনো। তবে তোমরা হচ্ছ শেয়ালপণ্ডিত। তোমাদের ধৈর্যের শেষ নেই।"

দিন যায়। কুলের চারাগুলো ডালপালা ছড়িয়ে বিশাল বড় হয়ে গেল। শেয়ালের খেত ভোঁ-ভাঁ। একটা ছাগলছানারও দেখা নেই। তাই দেখে ময়ূরের কী ফুর্তি! বলে, "আরে বন্ধু, তুমি দেখছি একেবারে স্বয়ং ভগবান। কতরকম



বড়মামা

শিশির চক্রবর্তী

আমিও দেখেছি ভাই
পুরো কলকাতাটাই
বড়মামা পুলিসের
সার্জেণ্ট কিনা!
কত লোকজন আসে
ঘন ঘন ফোন আসে
আমাদের সব কাজ
আর্জেণ্ট কিনা!
এখন কি দেখা পাবে
মামা তো ফরেনে যাবে
প্লেনে চড়ে সরাসরি
আর্জেণ্টিনা।

ভোজবাজি জানা আছে। এমন মন্তর ঝাড়বে যে, হাড়ের টুকরো ফুঁড়ে ছাগল বেরিয়ে এসে ব্যা-ব্যা করে ডাকবে।''

এসব হাসিঠাট্টার কথায় শেয়ালের হাড় জ্বলে যায়। কিন্তু নিরুপায়, সব সহ্য করতে হয়। কিছুদিন পরে ময়ূরের কুলগাছ ভরে কুল এল। কুল পাকতেই আত্মীয়-কুটুম ডেকে ভোজ খেতে বসল ময়ূর।

এদিকে শেয়ালের গর্তে খাবার মতো কিছুই নেই। এতদিন বন্ধুর পেছনে ঘুরে, আর বন্ধুর হাবভাব নকল করে দিন কেটেছে। খাবার-দাবার যোগাড় করে এনে ঘরে মজুত রাখেনি। এখন চুপ করে বসে ময়ূরদের ভোজ-খাওয়া দেখা ছাড়া আর উপায় কী? শেয়ালকে ও-রকম বসে থাকতে দেখে ময়ূর হেসে বলতে লাগল, "আরে পণ্ডিতজি, তুমি ও-রকম মুখ গোমড়া করে বসে কেন? আর ক'টা দিন সবুর করো, দেখবে তোমার পুঁতে দেওয়া সব টুকরো থেকে একেবারে একপাল ছাগল এসে যাবে। তখন আর ভাবনা কিসের?''

শেয়াল এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে, হাড় থেকে কোনোদিনই ছাগল গজাবে না। নেহাতই রেষারেষি করে ময়ূরের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিল ও। যা হবার তা হয়ে গেছে। নিজের বোকামির ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে এখন।

শেয়াল কোনো জবাব না দিয়ে মুখ শুকিয়ে বসে রইল দেখে, ময়ূরের উল্লাস আরও বেড়ে গেল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার মতো করে বলতে লাগল, "আরে ভাই, না খেতে পেয়ে দেখছি ভীষণ রোগাটে আর হ্যাংলা চেহারা হয়েছে তোমার। তা এ-বছর যেমন খরা হয়েছে, শুনছি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে। তুমি বাপু এখন থেকেই কুল খেতে শেখো। নয়তো শুকিয়ে মরবে যে।" একে খিদেয় ছটফট করছে, তার ওপর পরম বন্ধু ময়ূরের এ-রকম একটানা ঠাট্টা আর সহ্য হল না শেয়ালের। বিষম রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, "দেখ হে, কুল খেতে আমি শিখিনি ঠিকই, তবে কুলখেকোদের কীভাবে হজম করতে হয়, তা খুব ভাল করেই জানি।''

এই না বলে, ময়ূরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শেয়াল।

আসলে খিদেয় যার পেট জ্বলছে, তাকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা-তামাসা করতে নেই।

ছবি শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

ছবির মজা

এই ছবির বি-মার্কা ঘরগুলি নীল, জি-মার্কা ঘরগুলি সবুজ এবং আর-মার্কা ঘরগুলি লাল পেন্সিলে ভরাট করে দ্যাখো, কী মজা হয়।





এই ছবির মধ্যে চার-চারটি মাছ লুকিয়ে আছে। তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে খুঁজে বার করতে বলো। পারলে তাকে একটা লজেন্স দাও।

রাজহাঁস



আমার মায়ের রাজহাঁস পোষার খুব শখ। একে-তাকে বলে বলে চারটে রাজহাঁসের বাচ্চা মা আনালেন। সেই বাচ্চাগুলোকে মানুষ করার জন্যে রোজ ঘাসের চাপ কেটে আনতে হত। হলুদ-হলুদ রঙের বাচ্চাগুলো খুঁটে খুঁটে খেত। মাঝে মাঝে এমন টান দিত ঘাসে যে, টাল সামলাতে না পেরে পেছন দিকে উলটে পড়ে যেত। দেখতে খুব ভাল লাগত তখন। বাচ্চাগুলোর গা কী নরম! হাতের মুঠোয় ধরতে ভাল লাগত।

হাঁসের বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে বড় হল। তারপরই ধরা পড়ল তাদের কুটিল রূপ। মাঠে চলে যেত। ঘাস খেত। ধানখেতে গিয়ে অত্যাচার করত। গোলায় ধান তোলা হলে, গাদা থেকে ধান টেনে বের করত। এমন অত্যাচার করলে লোকেরা বিরক্ত হবেই। হাঁস-গুলোকে ইঁট-পাটকেল খেতে হত। বাবা বিরক্ত হলেন। মাও বিরক্ত হলেন। ঠিক এমন সময় দাদা-বৌদি বাড়ি এলেন বিদেশ থেকে। ভোজের কাজে ব্যবহৃত হল একটা রাজহাঁস। ঠিক করা হল, এমনি করে বাকি হাঁসগুলোকেও শেষ করা হবে।

কিন্তু একটি হাঁস যেদিন কমে গেল, সেদিন বাকি হাঁসগুলোর সে কী কান্না! তারা সারাদিন এদিক-ওদিক সেই হাঁসটিকে ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াল। কোথাও পেল না তাকে। সন্ধ্যায় তিনটি হাঁস বাড়ি ফিরে খেতে চাইল না। শুধু ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াল সঙ্গীকে। মায়ের মন ভাল ছিল না। মা সেই রাজহাঁসটির মাংস খাননি।

কঙ্কাবতী সরকার (বয়স ১৪)



ছবি এঁকেছে শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

নীলকণ্ঠ পাখি



এক যে ছিল পাখি
খাঁচায় পুরে রাখি
সোনার পালক তার
দেখতে চমৎকার
নীল আকাশের গায়
থাকতে সদাই চায়
তাই সে খাঁচা ছেড়ে
ছুট লাগালো তেড়ে
নীলকণ্ঠ পাখি
আমায় দিল ফাঁকি।

সুলগ্ন বিশ্বাস (বয়স ৭)

ভূতের সংসার



ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানা
তাদের সব হাসতে মানা
ভূত যাবে শ্বশুরবাড়ি
পেত্নি কেঁদে গড়াগড়ি।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় (বয়স ৯)

মিতালি



ছোট্ট মেয়ে মিতালি
স্বভাবটা তার ভালো
লেখে পড়ে ছবি আঁকে
যখন থাকে আলো।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী (বয়স ১০)



ছবি এঁকেছে **পিয়াসি মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৮)



ছবি এঁকেছে **স্নেহাশিস সেনগুপ্ত** (বয়স ৪)

সিঁড়িভাঙা বন্ধ

দিগদর্শক

শম্ভুর যেভাবে পা মচকেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি হাস্যকর। কলাগাছ বেয়ে উঠে কলা খাওয়ার কথা কেউ কখনো শুনেছ? হনুমান না হলে এমন বুদ্ধি মাথায় আসবে কেন? যাই হোক, বেশ উঁচু কলাগাছ, তাতে ধরে রয়েছে মর্তমান কলা। একেবারে পাকা, পাড়লেই হল। কিন্তু পাড়বার কোনো উপায় নেই দেখে সে গাছ বেয়ে উঠতে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল, আর পা-টাই বেচারার মচকে গেল! শম্ভুরা একদিনের জন্য পিকনিক করতে



গিয়েছিল বারাসতের কাছে তার কাকার বন্ধুর বাগানবাড়িতে। সেখানে ঐ রকম একটা ঘটনা ঘটায় পিকনিক প্রায় মাটি হতে বসেছিল আর কী। যাই হোক, অসহ্য ব্যথা নিয়ে সে কলকাতায় ফিরে এল, আর ডাক্তার তাকে দেখে বললেন, পা-টা মচকেছে। এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে—কয়েক দিনের মধ্যে সেরে যাবে মনে হচ্ছে। পায়েএকটা ওষুধ লাগানোর ব্যবস্থা আর ঠাণ্ডা জলে একটুখানি পা ডুবিয়ে পরমুহূর্তে গরম জলে পা ডোবানোর ব্যবস্থা করে দিলেন ডাক্তারবাবু। আর বললেন, সিঁড়ি দিয়ে একেবারেই যেন নামা-ওঠা সে না করে। তিন তলায় থাকে শম্ভুরা, কথা শুনে শম্ভুর ভ্রূ কুচকে উঠল। তার মনে যেন নেমে এল অন্ধকার। সে হতাশ হয়ে ভাবতে লাগল, কী করা যায়।

কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গেল। পায়ের ব্যথাটা তবু যায় না। ডাক্তারবাবু বললেন, "মুশকিলের কথা—একবার তাহলে এক্স-রে করাতে হয়।" হাড়টা কি ভেঙেছে তাহলে? কিন্তু হাড় ভাঙার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। এক্স-রে প্লেটে। ডাক্তার আরও কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। খাবার এবং পায়ে লাগানোর। এইভাবে চার মাস চলল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শম্ভুর পায়ের ব্যথা একেবারেই চলে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন, "বাপ্‌রে বাপ, খুব ভোগাল তোমার পা। তবে এখন আর ভয় নেই, কোনোরকম ভয় নেই। কিন্তু একটু সাবধানে থেকো বাবা, আর কলাগাছে কখনও উঠতে চেষ্টা কোরো না, বুঝলে?" বলে ডাক্তারবাবু প্রাণখোলা একটু হাসি হাসলেন।

শম্ভু বলল, "এখন আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারব তো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়—ওতে কোনো অসুবিধে হবে না। এখন তুমি ইচ্ছে করলে দৌড়তেও পারো।"

শম্ভুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "বাঁচালেন ডাক্তারবাবু—এ ক-মাস যে কী কষ্ট পেয়েছি তা বলার নয়, নামা-ওঠা করার জন্য প্রতি দিন বার চারেক জলের পাইপ বেয়ে ওঠা-নামা করেছি, সোজা কষ্ট হয়েছে আমার? ঠিক বলছেন তো, এখন থেকে সিঁড়ি দিয়েই ওঠা-নামা করতে পারি, নিশ্চিন্তে?"

এর পর ডাক্তারের চেহারা কীরকম হল তা আর না-বলাই ভাল।

ছবি দেবাশিস দেব



জাভেদ মিয়াঁদাদ

পাকিস্তানের আরও দু'জন

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

খুব বেশিদিনের আগের কথা নয়। এই বছরেরই ১৫ মার্চ। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউণ্ডের ড্রেসিং রুমে বাইশ বছরের এক যুবক কাঁদছিলেন। কাঁদছিলেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বিরাট একটা অঘটন ঘটে গেছে। তাই নিশ্চিত হারের মুখ থেকে বেঁচে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জয়ের মালা পরতে পারল।

চায়ের সময় অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেট হারিয়ে তিনশোরও বেশি রান করেছিল। সাতটি উইকেট হাতে, দরকার ছিল ৯৯ রানের। ফুড-পয়জনিং হওয়ার ফলে ইমরান খাঁ বিশেষ সুবিধে করতে পারছিলেন না। বোধ হয় রক্ষা পাওয়ার পথ নেই। এমন সময় সেই প্রায়-অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটল। সরফরাজ মাত্র



ওয়াসিম বারি ফটো বীরেন্দ্র ত্যাগী



মিয়াঁদাদ ফটো সন্তোষ ঘোষ

একটি রানের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার সাত-সাতটি উইকেট ফেলে দিলেন—মোট ৩৩টি ডেলিভারিতে! পাকিস্তান জিতে গেল ৭১ রানে। যুবকটি বলেছেন, এ-ঘটনা তাঁর পক্ষে কখনোই ভোলা সম্ভব নয়। যুবকটি কে জানো? তিনি হলেন পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান জাভেদ মিয়াঁদাদ খান!

কোমলস্বভাব মিয়াঁদাদ কিন্তু বোলারদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম। তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক। "আমি চেষ্টা করি যাতে বোলাররা আমার উপর খেপে যায়। কারণ আমি জানি যখন তারা রেগে বোলিং করবে, তখন তাদের বোলিং হবে বাজে, আর আমার পক্ষে মারতে সুবিধা হবে।" ফাস্ট বোলার হলে তো কথাই নেই। "ফাস্ট বোলারদের বল ঠেঙানোর মতো মজা আর কিছুতেই নেই, বিশেষত তারা যখন খেপে গিয়ে বাম্পার দেয়।"

১৯৫৭ সালের ১২ জুন করাচিতে জন্মেছেন মিয়াঁদাদ। ন'বছর বয়সে ক্রিকেট খেলেছেন রাস্তায়। পরে মুসলিম জিমখানাতে যাওয়া শুরু করলেন। জিমখানার সভাপতি ও'র বাবা। কিন্তু সেখানে বড়-বড় ছেলেরা খেলত। মিয়াঁদাদ একটু-আধটু ফিল্ডিং করতে

পেতেন, তিনি তাতেই কৃতার্থ। একদিন জিমখানার একজন খেলোয়াড় না আসার ফলে মিয়াঁদাদের সুযোগ জুটে গেল। সেই খেলায় দলের অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু ক্লাসটম্যান মিয়াঁদাদ সোজা ব্যাটে খেলে ম্যাচটাকে বাঁচিয়ে ড্র করে দিয়েছিলেন।

মিয়াঁদাদ প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ খেলেন ষোল বছর পাঁচ মাস বয়সে— ১৯৭৩-৭৪ মরসুমে। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭৬-এর অক্টোবরে লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এবং জীবনের প্রথম টেস্ট ইনিংসেই সেঞ্চুরির (১৬৩) কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর আগে মাত্র একজন পাকিস্তানিই এই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাঁর নাম খালিদ ইবাদুল্লা। আর এই টেস্টেই আসিফ ইকবালের সঙ্গে পঞ্চম উইকেট জুটিতে মিয়াঁদাদ যে ২৮১ রান করেছিলেন, সেটা যে-কোনও দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রেকর্ড।

আবার জীবনের তৃতীয় টেস্টেই মিয়াঁদাদ ডাবল সেঞ্চুরি পেলেন (২০৬) মাত্র ১৯ বছর চার মাস বয়সে। এত অল্প বয়সে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি আর কেউ করেন নি, এটা একটা রেকর্ড। এবং এটাই মিয়াঁদাদের সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর। আর লেগ-ব্রেক ও গুগলি বোলার মিয়াঁদাদের সবচেয়ে ভাল টেস্ট বোলিং ৭৪ রানে তিন উইকেট। অবশ্য আজকাল তাঁকে দিয়ে বোলিং বিশেষ করানো হয় না।

ভারতে আসার আগে পর্যন্ত মিয়াঁদাদ একুশটি টেস্ট খেলে মোট ১,৮৩১ রান করেছেন এর মধ্যে আছে ছটি সেঞ্চুরি। গড়ও চমৎকার—৭০·৪২। আর তাঁর সংগ্রহে আছে সতেরটি টেস্ট উইকেট, উইকেট-পিছু ৩২·৭০ রান দিয়ে। অবশ্য টেস্ট খেলার আগেই মিয়াঁদাদ পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রথম প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপে (১৯৭৫) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ম্যাচটিতে পাকিস্তান হেরে গিয়েছিল, কিন্তু মিয়াঁদাদ ওই ম্যাচে খুবই ভাল খেলেছিলেন। সাসেক্স কাউন্টি এবং কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটেও মিয়াঁদাদ খেলেছেন।

ক্রিকেটার মিয়াঁদাদের অনেক গুণ। যখন যেমন দরকার তেমন ব্যাটিং করেন—মারমুখী বা আত্মরক্ষামূলক। ক্যাচ ধরায় নিপুণ, এ-পর্যন্ত (টেস্টে) সতেরটি ক্যাচ ধরেছেন। ফিল্ডিং করতে ভালবাসেন, বল থ্রো করলে উইকেটকীপারের গ্লাভসে গিয়েই পড়ে সেটা।

মিয়াঁদাদ যেমন একটি টেসট রেকর্ড করেছেন, সেইরকম আর-একটি টেস্ট রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন আর একজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়। উইকেটকীপার ওয়াসিম হাসান বারি। উনি ১৯৭৯ সালের তেইশ ফেব্রুয়ারি অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে সাতজনকে আউট করে দিয়ে গ্রাউট, লিন্ডসে, মারে ও কিরমানির রেকর্ড ভেঙে দেন।

ওয়াসিম বারির জন্ম তেইশ মার্চ ১৯৪৮। টেস্টে প্রথম নামেন ১৯৬৭ সালে। ভারতে আসার আগে পর্যন্ত পঞ্চাশটি টেস্টে খেলে ১৩৮ জনকে আউট করেছেন, এর মধ্যে ষোল জন স্টাম্পড। রান করেছেন ৯১৮, সর্বোচ্চ রান সংখ্যা পঁচাশি। পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব করেছেন খুব অল্প সময়।

বারির সামনে এখন দুটি লক্ষ্য। দুটি রেকর্ড তাঁকে ছুঁতে হবে, ভাঙতে পারলে তো কথাই নেই। একটি হল ওয়ালি গ্রাউটের এক ফার্স্ট-ক্লাস ইনিংসে আটজনকে আউট করার রেকর্ড, অপরটি হল গিল ল্যাংলির একটি টেস্টে মোট ন'জনকে আউট করার রেকর্ড।

বলা যায় না, ওয়াসিম বারি এ-সব রেকর্ড করে ফেলতেও পারেন। তার জন্যে যদি গ্লাভস মেরামত করতে হয় কয়েক ঘন্টা, না হয় তাই করবেন। গ্লাভস মেরামতের ব্যাপারটা বোধগম্য হল না? তাহলে বলি ব্যাপারটা। যে-টেস্টে ওয়াসিম বারি রেকর্ড করেন তার আগের টেস্ট খেলাটি হয়েছিল নেপিয়ারে। "নেপিয়ারে দ্বিতীয় টেস্টে আমি ভাল উইকেটকীপিং করতে পারিনি। পরে দেখলাম আমার গ্লাভসের রাবার এমন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে যে বল ফসকে যাচ্ছে। তাই আমি পাঁচটি ঘন্টা খরচ করি গ্লাভস মেরামতের জন্যে। গত রাতে তিন ঘন্টা আর আজ ভোরে দু'ঘন্টা। যেটুকু বাকি ছিল তা শেষ করার জন্যে আমি আজ ভোর ছ'টায় উঠেছি।''

কথাগুলো ওয়াসিম বারি সাংবাদিকদের বলেছিলেন ১৯৭৯ সালের তেইশ ফেব্রুয়ারির বিকেলে, যেদিনের খেলায় তিনি রেকর্ডটি করেছিলেন।

শুরু করবেন সানি

অশোক দাশগুপ্ত

সে-অর্থে বিশ্ব একাদশ কখনও মাঠে নামেনি। ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ, যাতে ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ছিলেন না। এই ধরনের বিশ্ব একাদশে বিভিন্ন সময়ে খেলেছেন ভারতের মনসুর আলি খান পতৌদি, চন্দ্রশেখর, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার, সুনীল গাভাসকার এবং বিষেণ সিং বেদী। তবে মাঠে না নামলেও পৃথিবীর সেরা এগারোজন ক্রিকেটার বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক ক্রিকেট-অনুরাগীর মাথাতেই ঘোরে। এখন আমরাও সানন্দে এই বিষয়ে ভাবতে পারি, কেননা, ব্যাটিং অর্ডারে প্রথমেই লেখা হবে একজন ভারতীয়র নাম। হ্যাঁ, সুনীল মনোহর গাভাসকারকে বাদ দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেট একাদশ গড়ার ক্ষমতা এখন কারও নেই।

বেশ নিশ্চিন্ত মনে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। গাভাসকারের সঙ্গে ইনিংসের গোড়ায় ব্যাট হাতে নামবেন কে? প্রার্থী তিনজন: জিওফ বয়কট, গর্ডন গ্রীনিজ এবং মজিদ খান। ব্যারি রিচার্ডস প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ভাবায় এবং গ্লেন টার্নার সম্প্রতি ফর্ম হারাবার জন্যে এই আলোচনায় আসছেন না। জিওফ বয়কট নিশ্চয় বড় ব্যাটসম্যান এবং মজিদ খানের ব্যাটিংও দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে টীমে আনা যেতে পারে গর্ডন গ্রীনিজকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং হ্যাম্পশায়ারের এই মারমুখী ওপেনার স্লিপে ফিল্ডিংও করেন চমৎকার।

তিন নম্বরে আসবেন এখনকার ক্রিকেট-দুনিয়ার এক নম্বর ব্যাটসম্যান ভিভিয়ান রিচার্ডস। কয়েক বছর এমন ফর্মে থাকলে সর্বকালের সেরাদের যাবতীয় রেকর্ডের দিকে নিশ্চয় ধেয়ে যাবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ব ভিভ রিচার্ডস। চার নম্বরে, রিচার্ডসেরই মতো অনায়াসে টীমে এসে যাবেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল—অন সাইডে যাঁর মতো স্ট্রোক প্লেয়ার এখন দুনিয়ায় নেই।



কিন্তু পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান বাছতে গিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে হতে পারে প্রচণ্ড গণ্ডগোল, প্রবল উত্তেজনায় টেবিলের কাচ-টাচ ভেঙে চৌচির হওয়াও অসম্ভব নয়।

ঐ প্রবল তর্কে ঢোকার আগে পরের অংশগুলোর কথা ভাবা যাক একটি ব্যালান্সড টীমে থাকা উচিত পাঁচজন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান, একজন অল-রাউণ্ডার, চারজন বোলার এবং একজন উইকেটকীপার। চারজন বোলারের মধ্যে স্পিনার এবং পেস বোলারের সংখ্যা সমান হলে ভাল, কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পেস বোলারদেরই প্রাধান্য—সুতরাং আমাদের টীমে থাকবেন তিনজন পেস বোলার এবং একজন স্পিনার।

ছ'নম্বর ব্যাটসম্যান হবেন একজন প্রথম শ্রেণীর অল-রাউণ্ডার। ইয়ান বোথাম, ইমরান খান, মাইক প্রোক্টর এবং ক্লাইভ রাইমের মধ্যে যে-কোন একজন খেলতে পারেন। তবু প্রথমেই উঠবে মাইক প্রোক্টর এবং ইয়ান বোথামের নাম। টেস্ট ক্রিকেটের দ্রুততম ডাবল্-এর (এক হাজার রান ও একশো উইকেট) অধিকারী বোথামকেই আমরা নিচ্ছি। কথা উঠতে পারে, এই নির্বাচন প্রমাণ করে যে আমরা প্যাকার সার্কাসের বিরোধী টেস্ট ক্রিকেটের সনাতন দলের লোক। সত্যি কথা বলতে কী, তা একটু আছি।

সাত নম্বরে আসবেন টীমের উইকেটকীপার। দু'বছর আগে হলেও অ্যালান নট ছাড়া অন্য কোনও নাম উঠত না। কিন্তু এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যাণ্ডের নির্বাচকরা নটকে টীমে স্থান দেননি। যিনি নিজের দেশের টীমেই আসেন না, তাঁকে বিশ্ব একাদশে কীভাবে নেওয়া যায়? কাছাকাছি আছেন রডনি মার্শ। একটু নীচে ওয়াসিম বারি, সৈয়দ কিরমানি এবং বব টেলর। তবু অতুলনীয় রেকর্ড এবং অটুট ফর্মের কথা মনে রেখে আমরা অ্যালান নটকেই বেছে নেব। দিনের প্রায় শেষ দিকে একজন ভাল ব্যাটসম্যান আউট হতেই হয়তো নাইটওয়াচম্যান হয়ে আসবেন নট।

বেদী-চন্দ্র-প্রসন্নর বিদায়ের পর বিশ্ব একাদশের একমাত্র স্পিনারের জায়গাটি অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের ডেরেক আণ্ডারউড, যিনি বৃষ্টির পর ভয়ঙ্কর। শুকনো পীচেও তিনি নিখুঁত লেংথে বল করেন, তবে হীরো হন ভিজে পীচে। এক বিখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেট লেখক বলেছিলেন, আণ্ডারউডকে সব সময় ইংল্যাণ্ড টীমের সঙ্গে রাখা উচিত, ঠিক ছাতার মতো। এই ছাতাটিকে আবার বিশ্ব একাদশেও রাখতে চাই।

তিনজন পেস বোলারের জায়গায় লড়তে পারেন অন্তত ছ'জন—ডেনিস লিলি, জেফ টমসন, অ্যাণ্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং জোয়েল গারনার এবং কলিন ক্রফট। অল-রাউণ্ডার প্রোক্টর এবং ইমরানও বোলার হিসেবেই টীমে আসতে পারেন। তবু, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান গাভাসকারের বিচারে সেরা ফাস্ট বোলার অ্যাণ্ডি রবার্টসকে আমরা প্রথমেই টীমে আনব। লিলির প্রতিভা এবং ক্ষমতা সম্পর্কেও পৃথিবীর প্রায় সব বড় ব্যাটসম্যান একমত। তৃতীয় ফাস্ট বোলার হিসেবে আমরা টমসনকে নিচ্ছি। তবে বাদ-যাওয়া তিন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান যখন-তখন টীমে এসে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ঐ পাঁচ নম্বরের গোলমেলে নির্বাচনটা এখনও হয়নি। মজার ব্যাপার হল, এই পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে আমরা যাকে আনছি, তিনিই হচ্ছেন টীমের ক্যাপ্টেন। কিন্তু ক্লাইভ লয়েডের নির্বাচনে গণ্ডগোল এড়ানোর রাস্তা ছিল না। লাইনে যে ব্যাটসম্যানেরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা হলেন : ইয়ান চ্যাপেল, জাহির আব্বাস, ডেভিড গাওয়ার, আলভিন কালীচরণ এবং গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। তবু ক্লাইভ লয়েডই এলেন।

বিশ্ব একাদশ কোন্ টীমের বিরুদ্ধে খেলবে? অন্য কোনও গ্রহের ক্রিকেট খেলার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে যার বিরুদ্ধেই হোক, খেলাটা যদি ইডেন গার্ডেনে হয়, লয়েড সাহেব যেন টসে জেতেন! প্রথম দিনেই আমরা ব্যাট হাতে দেখতে চাই আমাদের সানিকে।

বোম্বাইয়ে জয়

পুষ্পেন সরকার

একদিন বিরতির পর বোম্বাইয়ে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা শুরু হল। দর্শকে ভর্তি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। ভারত তিন উইকেটে ১১৭ রান নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামছে। গাভাসকর, বিশ্বনাথ, চৌহান আগেই আউট হয়েছেন। ভরসা এখন বেঙ্গসরকার (৪২) ও যশপাল (৫)।

খেলা শুরু হতেই দেখা গেল ইকবাল কাশিমের বাঁ-হাতি স্পিনের জাদুতে উইকেট পড়ছে শুকনো ঝরাপাতার মতো। ভারতের ব্যাটসম্যানরা আসছেন আর ফিরে যাচ্ছেন। শেষ ছ' উইকেটে মাত্র ৪৩ রান। ১৬০ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের যবনিকা। সর্বোচ্চ রান গাভাসকর (৪৮)। তারপর বেঙ্গসরকার (৪৫)। নির্ভর করার মতো আর কেউ নেই।

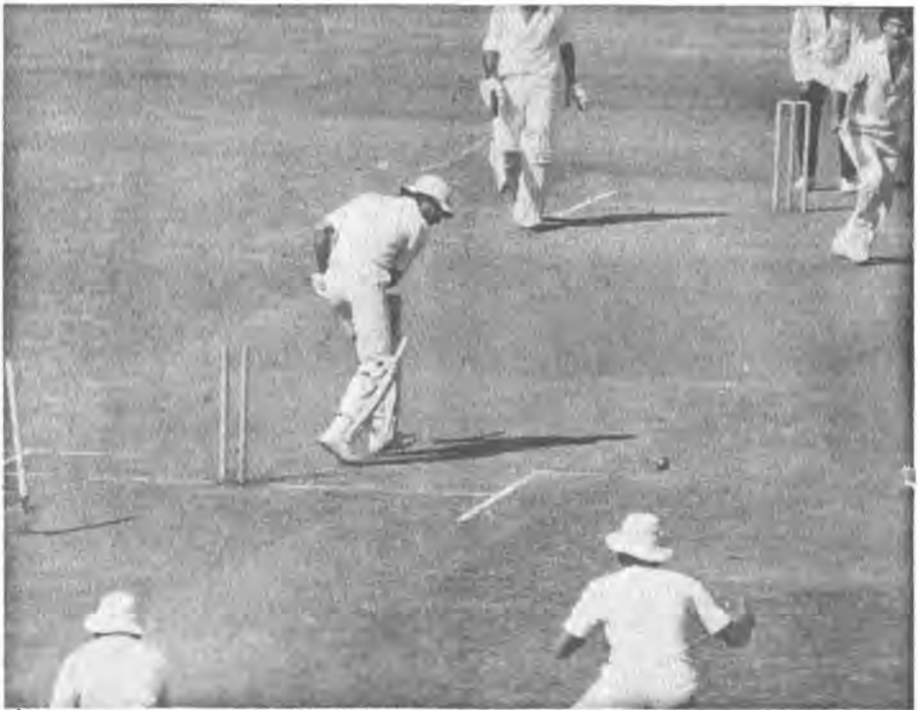


বখতের বলে আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন গাভাসকার



বেঙ্গসরকার (ধীরস্থির, সতর্ক)

দুই ইনিংস মিলিয়ে ভারত পাকিস্তানের চাইতে ৩২১ রানে এগিয়ে। ৩২২ করলেই পাকিস্তান জিতবে। দেড়দিন হাতে। অতীতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বহুবার এই সময়ের মধ্যে এর থেকে বেশি রান করেছে। মধ্যাহ্নভোজের আগে দশ মিনিট ব্যাট করে পাকিস্তান কোনও উইকেট হারায়নি। আমাদের সকলেই চিন্তিত। লাঞ্চ প্যাকেটে অরুচি।



বিনির বলে জাহির আব্বাসের উইকেট ছিটকে গেছে

মধ্যাহ্নভোজের পরেই ক্রিকেটে নাটক শুরু হয়ে গেল। ন্যাটা কারসন ঘাউড়ির হাত থেকে ছোঁড়া চকচকে নতুন বল পাকিস্তানের উইকেটে ছোবল দিতে থাকল। দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান মজিদ ও মুদাসসারকে ফিরিয়ে দিলেন ঘাউড়ি। স্কোর বোর্ডে ৩২। কপিল ছিটকে দিলেন জাহির আব্বাসের মূল্যবান উইকেট। ঘাউড়ির বিষ-মেশানো স্পিনের মোকাবিলা করতে পারলেন না ওয়াশিম রাজা। চার উইকেটে ৪৮।

আর যায় কোথায়! ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তখন আনন্দের প্লাবন। উত্তেজনায় অনেকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জয়ের কথা ভাবতে গিয়ে মিয়াঁদাদের দিকে তাকিয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত। কী অসীম সাহস ও দক্ষতা দেখিয়ে ব্যাট চালাচ্ছেন। দলের বিপদ যে করে হোক কাটিয়ে তুলবেন।

আসিফ ইকবাল এসে মিয়াঁদাদকে সাহায্য করতে থাকলেন অধিনায়কোচিত দৃঢ়তায়। আসিফ যদিও বা ফিরলেন, কিন্তু বোলার ইমরান হয়ে উঠলেন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। নিজেকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ কৌশলই হল আক্রমণ করা—এই নীতি নিয়ে মিয়াঁদাদ ও ইমরান ভারতীয় বোলারদের আক্রমণ ঠেকাতে লাগলেন। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ৬১। দর্শকরা এবার রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু উদ্বেগ বেশিক্ষণ থাকল না। ইমরান ও মিয়াঁদাদ বিদায় নিতেই ভারতের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরাজয়ের মুখে মিয়াঁদাদের সংগ্রামী ও সাহসী ৬৪ যে-কোনও সেঞ্চুরির চাইতেও বেশি মূল্যবান।

চতুর্থ দিনেই খেলার মীমাংসা হয়ে গেল। ভারত জিতল ১৩১ রানে। ভারতের এই জয়ের অনেকটা কৃতিত্ব দুই ন্যাটা বোলার ঘাউড়ি ও দোশির। ঘাউড়ি পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলেন মজিদ, মুদাসসার নজর, রাজা ও ইমরানের উইকেট নিয়ে। দোশি ঘাউড়ির অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন মিয়াঁদাদ, আসিফ ও বারির উইকেট নিয়ে। এবারে বোম্বাইয়ে


2-in 1

বাঁ-হাতি বোলারদেরই জয়-জয়কার। পাকিস্তানের ইকবাল কাশিম পেয়েছেন দশটি উইকেট। দোশির সংগ্রহ ছ'টি। ঘাউড়ি চারটি। মোট কুড়িটি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন বাঁ-হাতি বোলাররা।

তবে, এই জয়ের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। একত্রিশ রানের মধ্যে গাভাসকর ও চৌহানের উইকেট হারিয়ে ভারতীয় ইনিংসের যখন নড়বড়ে অবস্থা, তখন বেঙ্গসরকার (৫৮) ও বিশ্বনাথ (৪৭) জুড়ির ৮০ রান খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কপিল (৬৯), কিরমানি (৪১), ঘাউড়ি (৩৬) ও যাদব (অপরাজিত ২৯) দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতের শেষ দিকের ব্যাটসম্যানেরাও বড় ইনিংস গড়তে পারে (৩৩৪)।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত জিতল দীর্ঘ ২৭ বছর পরে। '১৯৫২-৫৩ সালে আবদুল হাফিজ কারদারের নেতৃত্বে প্রথম পাকিস্তানি দলের বিরুদ্ধে অমরনাথের ভারতীয় দল দুটি টেস্ট জিতেছিল। দিল্লিতে প্রথম টেস্টে এক ইনিংস ও ৭০ রানে। বোমবাইয়ে তৃতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে। চারদিনের পাঁচ-টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের জয় ছিল একটি। অবশিষ্ট দুটি ড্র।

এর পর পাকিস্তান এবং ভারতে দুটি সিরিজের দশটি টেস্ট টানা ড্র। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সফরে বেদির দল তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে হেরে যাওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ের সংখ্যা হয়েছিল তিন। বোম্বাইয়ে তৃতীয় টেস্টে ভারত জয়ী হওয়ায় দু' দেশেরই জয়ের সংখ্যা হল সমান।

এই সিরিজে ভারত একটি টেস্টে এগিয়ে যাওয়ায় কানপুর, মাদ্রাজ এবং কলকাতার বাকি তিনটি টেস্টে জোর লড়াই হবে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি সেই যুদ্ধের কাহিনী শোনার জন্যে। কিন্তু এই লেখা তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই কানপুর টেস্ট শেষ হয়ে যাবে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

মেকং

দিদিমণি



এশিয়ার মানচিত্র খুললে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেখতে পাবে ইন্দোচীন উপদ্বীপ—এই উপদ্বীপের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে বিখ্যাত মেকং নদী। ২৫০০ মাইল বা ৪,০০০ কিলোমিটার লম্বা এই নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এশিয়ার মধ্যে দৈর্ঘ্যে এর স্থান সপ্তম। চীনের চিংহাই প্রদেশ থেকে বেরিয়ে ইউনান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে এই নদী ব্রহ্মদেশ, লাওস ও থাইল্যান্ডের সীমানা রচনা করেছে। তারপর লাওস কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে দিয়ে সায়গন শহরের দক্ষিণে গিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়েছে। লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েন এবং কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন, এই দুটি শহরের পাশ দিয়েই এই নদী বয়ে গেছে।

তিব্বতের মালভূমি থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত মেকং নদীর অববাহিকার আয়তন ৩০৭,০০০ বর্গমাইল। প্রথম ১,১৫০ মাইল গতি-পথে মেকং নদী খুব একটা চওড়া নয় এবং এখানে মেকং নদী চীনের পার্বত্য ভূমি ও মালভূমি কেটে বয়ে যাচ্ছে। নিম্নভাগে মেকং নদী ব্রহ্মদেশ ও লাওসের সীমানা নির্ধারণ করছে এবং সেখান থেকে মোহনা পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১,৪৫৪ মাইল। মোহনায় গিয়ে এই নদী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

উচ্চভাগে মেকং নদী পার্বত্য অঞ্চলে গভীর খাত সৃষ্টি করেছে। এই অংশ খুবই দুর্গম। তারপরের অংশে এই নদী লাওস, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে।

উচ্চ অংশে চিংহাইয়ের সীমানায় অবস্থিত তিব্বতের উচ্চভূমি থেকে এই নদী বেরিয়েছে। এই জায়গার উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট এবং এইখানে মেকং নদীর নাম পাম এবং জি চু। তারপর এই নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তিব্বতের চামডো অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এর পরে লান শাঙ চিয়াং নামে ইউনানের উচ্চ-ভূমির মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিকে বয়ে গিয়ে চীন ও ব্রহ্মদেশের সীমানা রচনা করেছে। তারপর নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়ে ১২৫ মাইলেরও বেশি ব্রহ্মদেশ ও লাওসের সীমানা রচনা করছে।

ব্রহ্মদেশের পরে এই নদীর উপত্যকাকে ছটি ভাগে ভাগ করা যায়—উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, কোরাট মালভূমি অঞ্চল, পূর্বের উচ্চ-ভূমি অঞ্চল, দক্ষিণের নিম্নভূমি এবং বদ্বীপ অঞ্চল। পাহাড়ের ঢালে পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়—কোথাও কোথাও চাষবাসের জন্যে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। কোরাট মালভূমি অঞ্চল থাইল্যান্ড ও লাওসের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। লাওস থেকে অনেক উপনদী মেকং নদীতে এসে মিশেছে। এই সব অঞ্চলে বনভূমি ধ্বংস করে অনেকটা জায়গা পশুচারণের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

নমপেনের নীচে নদী দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি ভাগের নাম মেকং এবং অন্য ভাগের নাম ব্যাসাক। এর পর মেকং নদীর বদ্বীপের অংশ শুরু হয় এবং নদী সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। সম্পূর্ণ বদ্বীপের আয়তন ২৫,০০০ বর্গমাইল। এই বদ্বীপ অঞ্চলকে উচ্চ ভাগ, মধ্য ভাগ ও নিম্ন ভাগ—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

মেকং নদীর বেশির ভাগ জলই আসে মৌসুমী বৃষ্টিপাত থেকে। এপ্রিল মাসে জল সবচেয়ে কম থাকে। আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে নদীতে জলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। মে মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ার জন্যে জলবায়ু শুষ্ক থাকে। এই শুষ্কতার জন্যে জলসেচ ছাড়া এখানে ধান চাষ করা যায় না।

জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বদ্বীপ ও কোরাট মালভূমি অঞ্চলে। ছোট ছোট সামুদ্রিক জাহাজ নমপেন পর্যন্ত যেতে পারে। নদীতে কোহনে জলপ্রপাতের জন্যে নৌ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়।

বাঘা





(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কুন্তক

বুঝলি টুম্পি, আমার আর কবি হতে বেশি দেরি নেই।

কী করে বুঝলে?

ওই তো, কাকু তো শিখিয়েই দিল। এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে দিতে পারলেই হল।

পারবে মেলাতে?

পারব না কেন? এ তো প্রায় মুখস্থ। কিন্তু বয়ে যাচ্ছে দেখলেই বলব নদীর মতো, ভীষণ কিছু হলে বজ্রের মতো বা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, মিটমিট করলে, তারার মতো, দৌড় দেখলেই বলব হরিণের মতো...

ঘোড়া?

হ্যাঁ, ঘোড়ার মতোও কখনো। এইরকম সব লিস্টি করে খাতায় টুকে রাখব। সব কবিরই নিশ্চয় ওরকম একটা খাতা আছে।

আছে নাকি কাকু?

নন্তুর মতো কবিদের আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বাপু নন্তু, তোমার ওই ঘষা কবিত্ব তো কেউ নেবে না।

ঘষা কবিত্বটা আবার কী-রকম জিনিস?

কেন, ঘষা পয়সা শুনিসনি? বাসের কনডাকটর ফেরত দেয়নি কখনো অচল পয়সা? ব্যবহার হতে-হতে ক্ষয়ে গেলে বাতিল করে দেয় তো সেটাকে?

উপমাও সেরকম ক্ষয়ে যায় কাকু?

যায়ই তো। পাঠক তখন কনডাকটর হয়ে বলে, চলবে না, এটা বদলে দিন।

বদলে দিতে না পারলে?

না পারলে? না পারলে বলবে, নেমে যান বাস থেকে। তুমি যে এখনো বলবে মেঘের মতো চুল, পদ্মের মতো মুখ কিংবা হরিণের মতো দৌড়, সেটা চলবে না।



তাহলে কি সব সময়েই নতুন ঝকঝকে পয়সা বানাতে হবে? ইকনমিক্‌স্ তো পড়োনি তুমি!

সব সময়ে যদি না-ও হয়, প্রায় সময়েই চাই। বড় কবিরা তা পেরেও যান অনেক সময়ে। এক-একটা পয়সায় আবার এমন করে নিজেদের চিহ্ন এঁকে দেন কবিরা যে, অন্য কারো সেটা ছোঁয়া মুশকিল।

সে কী-রকম?

ধর্‌, সূর্যাস্তের লাল আভা। কত রকম করেই তো বলা যায় এই লালটার বর্ণনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেই নতুন রকম করে বললেন 'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা', ব্যস্‌, ওইটে তাঁর একেবারে নিজের হয়ে গেল। এখন যদি নন্তুও বলে, চিতার মতো লাল সূর্য, তাহলে ওকে বাস থেকে নামিয়ে দেব। কিংবা ধর্‌, কালিদাস লিখেছিলেন—কালিদাস রায় না কিন্তু—সেই যে মহাকবি কালিদাস—তিনি লিখেছিলেন, পাহাড় থেকে ঝর্না নামছে, যেন ব্রাহ্মণের গলায় উপবীত।

উপবীত কী কাকু?

পৈতে জানিস না? সেই পৈতে। ব্যস্‌, হয়ে গেল ওটা তাঁর নিজের পয়সা। চোখের কথা তো কত লোক কত রকম করে বলেছে। জীবনানন্দের কবিতা জানিস কিছু?

জানি জানি। কী বলবে এখন, তাও জানি। শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গেছি। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' এই তো বলবে? নতুন কিছু বললেই কি সেটা ভাল হবে? এ কি কিছু ভাল হল?

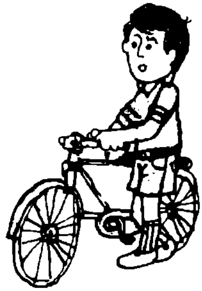
ওটা অবশ্য বলছিলাম না আমি, বলছিলাম বেতের ফলের মতো চোখের কথা। কিন্তু ওটাই বা দোষ কী করল?

পাখির বাসা দেখিনি ভেবেছ? সেইরকম চোখ? বাপস্‌

চোখ গোল-গোল করে টুম্পি বলল : পাখির বাসার মতো দেখতে চোখ? ইস্‌, সে বড় বিশ্রী!

নন্তু বলল : ঠিক এখন যেমন হয়েছে তোর।

নিশ্বাস ফেলে বলি : চোখ দিয়ে দেখাই জানলি কেবল? মনটা বুঝি কিছু নয়? বেশ, মনের কথা বলব কাল। (ক্রমশ)



প্রসাদ

বন্ধুর বাড়িতে চম্বল যখন পৌঁছল তখন প্রায় পৌনে-এগারোটা। এত দেরি অবশ্য হত না। মা সব সময় ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, "রাস্তা দিয়ে কখনও জোরে সাইকেল চালাবে না। যদি কোনও-দিন দেখি জোরে চালিয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে তালা-চাবি দেব।" তারপর? ওরেব্বাস্! সে-কথা ভাবতে এখনও তার মাথা ঝিম-ঝিম করছে!

Chambal saw a small crowd in the street.
He was in a hurry, but he had to stop.
He got off his bicycle.
It was nearly half-past ten.
He knew his friends would be waiting for him.
"My friends will be waiting for me," he said to himself.
But he felt he had to see what was happening.
"What's happening ?" he wondered.
"I just have to see what is happening," he thought.
The people were standing in a ring.
They were talking in an excited manner.
"How terrible !" some were saying.
"Where's the lorry ?" some were asking.
"It was the boy's fault," one said, "he was riding too fast."
Someone asked the crowd to stand away.
"Get an ambulance !" someone cried.

চম্বল সাইকেল নিয়ে এগিয়ে গেল।

He peered in through the crowd.
He looked just once.
Then he turned away.
He had to.
His head reeled.
He felt sick.
He felt weak in the knees.
He couldn't get on bicycle.
He felt he must sit down for a while.
"I must sit down for a while," he said to himself.
It was sometime before he could start for his friend's house again.

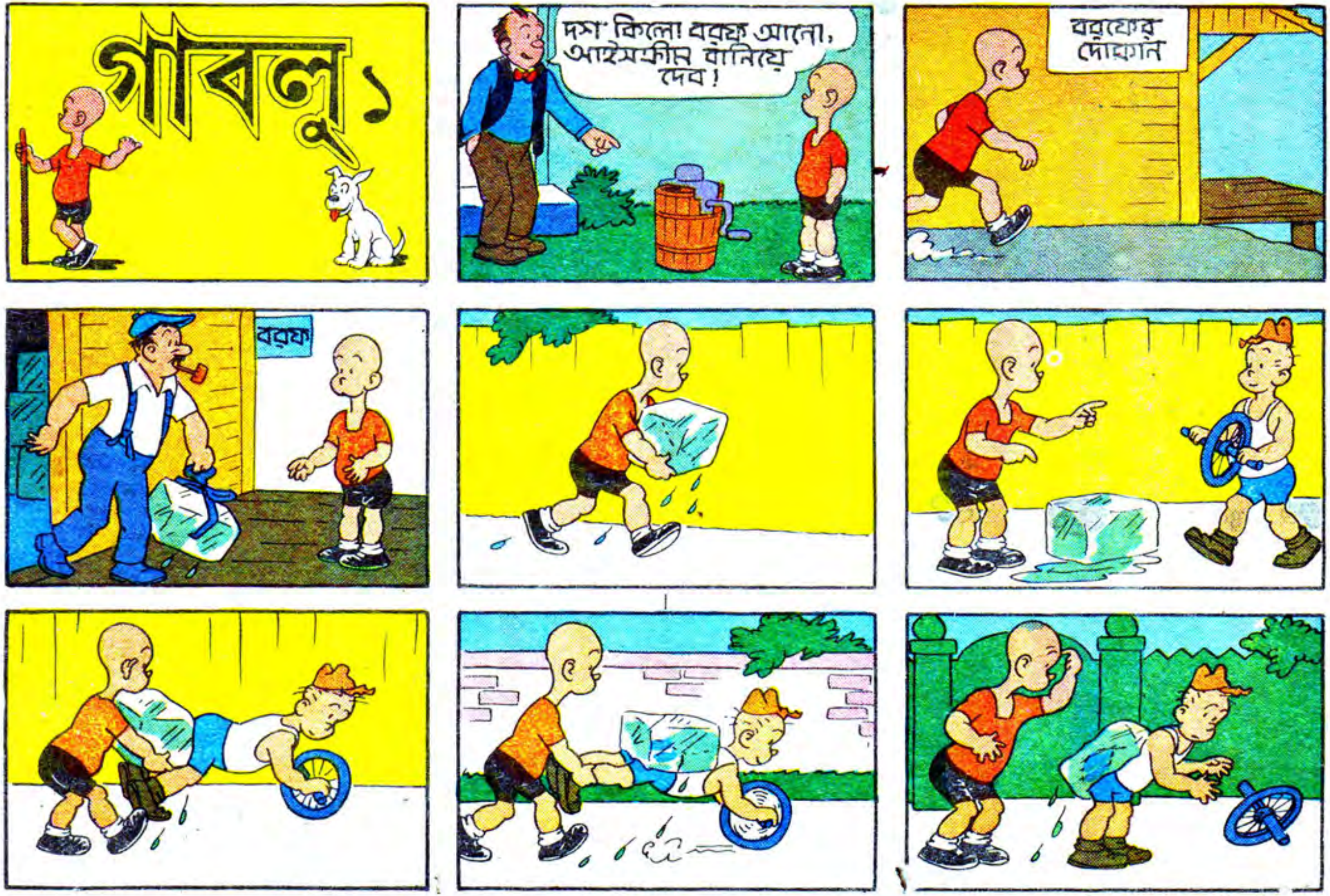
সব কথা শুনে কুণালের মা খুব রাগ করলেন।

You think you have to reach your friend's house in time.
You think it's very important.
You think you mustn't keep your friends waiting.
Well, that may be important.
But what about your mother ?
Won't she be waiting for you, too ?
Won't she be anxious if you don't get home in time ?
Hasn't she told you not to ride too fast ?
Do you suppose you have to think only of your friends ?
Do you suppose you need not think of your mother, too ?

এটা পড়ার সময়ে এই কথাগুলোর ওপর বিশেষ লক্ষ রাখবে :

have to, must, need not.

পরের বার এ নিয়ে আবার কথা হবে।

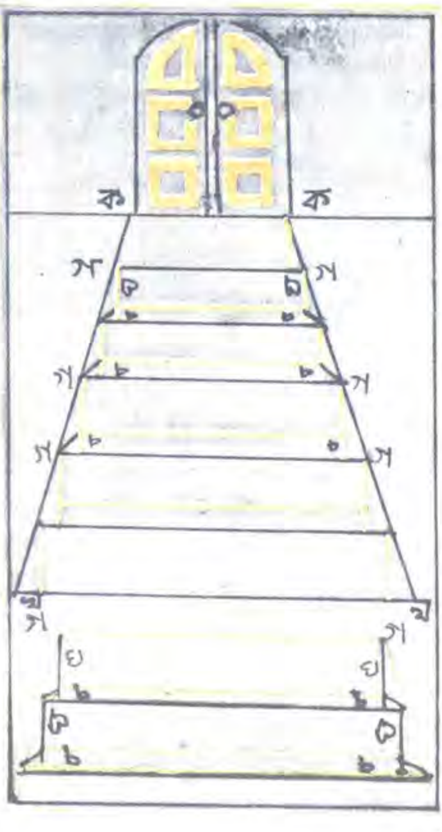

গাবলু ১
দশ কিলো বরফ আনো, আইসক্রীম বানিয়ে দেব!
বরফের দোকান
বরফ


গাবলু ২

সিঁড়ির ধাপ—আরও

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গতবার দ্ব'পাশের লম্বা "ঘ" চিহ্নিত রেখাকে প্রয়োজন মতো ভাগ করে, তাদের দ্বই বিন্দ্বকে মিলিয়ে "চ" চিহ্নিত রেখা পেয়েছ। এবার মন দিয়ে শোনো। "ঘ" রেখার ওপর যেখানে "চ" রেখা মিলেছে, সেই বিন্দ্ব থেকে "গ" রেখার আরম্ভের বিন্দ্বতে ("গ" থেকে "গ" পর্যন্ত কালো রঙের যে আড়াআড়ি ধাপের রেখা গেছে) কোনাকুনি মিলিয়ে দিলেই দেখবে, সামনের সিঁড়ি তোমার জন্যে তৈরি।



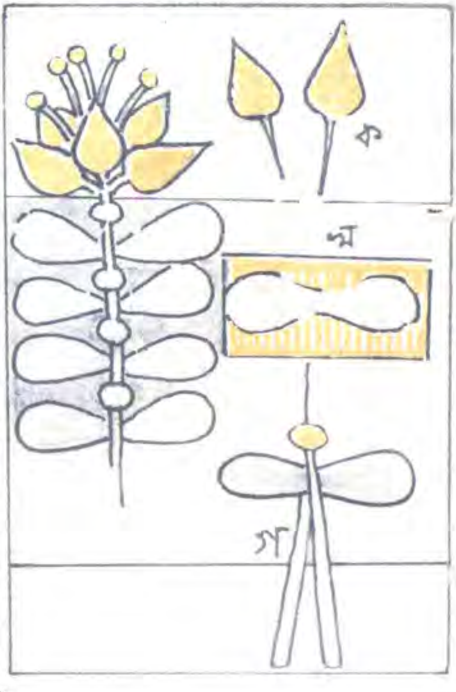
বাঁশের কাজ—আরও ফুল।

কারিগর

অন্যরকম ফ্বল দিয়ে আরম্ভ করো। ফ্বলের কু'ড়ির জন্যে মোটা বাঁশের ট্বকরো থেকে তৈরি করে নাও। ('ক' ছবি) ডাঁটির কাঠি তৈরি করার সময় ওপরে সর্ব আর নীচের দিকে মোটা করার কথা ভুলো না। ডাঁটির মাথার দিকের খানিক অংশ ছেড়ে নীচের দিক থেকে ডাঁটির মাঝ বরাবর চিরে নাও। এবার সেই চেরা ডাঁটির কাঠির মধ্যে জোড়া পাতা এক এক করে গ'্বজে এ'টে দিতে হবে সামান্য ফেভিকল দিয়ে।

জোড়া পাতা তৈরি করার জন্য ফরমা করে তৈরি বাঁশের পাতির ওপর পর-পর ফেলে নকশা মাফিক কেটে নিলেই হবে ('খ' ছবি)। প্বরো ফ্বল শেষ করার জন্যে আসছে-বার দেখো।

জেনে রাখো—(১) কু'ড়ি তৈরি করার সময় ছ্বরি খ্বব আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে না চালালে বাঁশের ট্বকরো ফেটে যাবে। (২) ডাঁটির কাঠি চেরার আগে তার মাথায় প্ব'তি বসিয়ে বা বে'ধে না নিলে সম্প্বর্ণ চিরে আলাদা হয়ে যাবে। (৩) ইচ্ছে করলে পাতায় বা কু'ড়িতে পছন্দমতো ফেবরিক রঙ ব্যবহার করতে পারো।




দুষ্টুমী করার
এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন,
হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও
স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে—
এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে
ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে—
এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই।
সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন
মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি'
উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব
চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে
দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN
MASSAGE OIL FORTE
CONTAINS VITAMIN A&D AND OLIVE OIL
SUNNY
সানি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড


আবার এল মাখন চোর
বিজয়া
পাস্তুরাইজড
মাখন
দেখলেই জিভে জল আসে!
পাতে খাওয়ার মাখনের দুনিয়ায় বিজয়া মাখনই হল বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মাখন পাস্তুরাইজড, স্বাদে অপূর্ব, সুন্দর গন্ধে ভরা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্যাক করা। জিভে জল আসা মাখনের স্বাদ পেতে হলে আজই বিজয়া মাখন কিনুন।
বিজয়া মাখন–ইস্ কি স্বাদ, দেখলেই সবাই কিনতে চায়
অন্ধ্র ডেয়ারী
(অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)
হায়দ্রাবাদ-৫০০ ৭৮৯
Vijaya
PASTEURISED
BUTTER
বিজয়া